দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৪র্থ সংখ্যা ❖ ১৭ জুলাই ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- একান্ত নিজস্ব অনুগত একটা দালাই লামা চায় চিন ২
- ট্রাম্প সরকারের আদর্শ কি মোদী সরকার ? ৫
- এলোমেলো কথা : আমার বন্ধু সুচেতনাকে দিলাম এ লেখা কারণ সে রবীন্দ্রনাথের ইরান নিয়ে লেখা এই কবিতা উদ্ধৃত করেছে ৭
- ইসরাইলের পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি হয়ে ওঠার পথে অনেক বাধা ৮
- এখন বাংলাদেশ : প্রজন্ম চত্বর ভেঙে ফেলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলা হচ্ছে ৯
- বিহারে এস আই আর তিন কোটি মানুষের ভোটাধিকার হরণের আশঙ্কা. ৯
- বিহারের নির্বাচন জনজাতি, দলিত ও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়ে বিজেপিকে জয় করার ছক ১১
- বিদ্বেষের রাজনীতিতে পিতৃব্য হয়ে উঠতে চাইছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ১৩
- ভূস্বর্গ সন্দর্শনের স্বপ্ন সার্থক ১৪
- জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কথাকার প্রফুল্ল রায় ১৭
- কৃষি অর্থনীতিবিদ নৃপেন বন্দোপাধ্যায় প্রয়াত ১৮
- স্বাধীনতা সংগ্রামী , আইনজ্ঞ ও মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার অবস্থান ২১

➲সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি বিদেশী ?

বিগত কয়েক মাস যাবৎ দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলাভাষী মানুষদের সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে ও তাঁদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলমান) মানুষ আছেন। এদেরকে বাংলাদেশী মুসলমান বা মিয়ানমার থেকে সেখানকার মৌলবাদীদের অত্যাচারে আগত রোহিঙ্গা বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।

ইতিমধ্যেই ওড়িশা , মহারাষ্ট্র , দিল্লী, রাজস্থান , অসম প্রভৃতি রাজ্য থেকে এই সব বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষের ওপর হৃদয়হীন আক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে। এঁদের কাছে থাকা কোনও বৈধ পরিচয়পত্র যথা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড কিছুই ওই সব সরকার মানেন না। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন ফেলেছে অসমের ঘটনাগুলি। এনআরসি প্রক্রিয়ার নামে বহু বছর ধরে বসবাসরত নাগরিকদের ‘ডকুমেন্ট যাচাইয়ের’ ছুতোয় বিদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশের কাছেই ভোটার কার্ড, আধার, ভূমি পাট্টা বা জন্ম প্রমাণপত্র থাকলেও ফরেনার্স ট্রাইবুনাল তা ‘অগ্রাহ্য’ করে রেখেছে। দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ এলাকার জয় হিন্দ কলোনি, যেখানে বহু নিম্নবর্গের বাংলাভাষী শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে বাস করছিলেন, সেই বস্তি সম্প্রতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে ওই মানুষগুলি দিন কাটাচ্ছেন।

রাজস্থানে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি। মুখ্য অভিযোগ একটাই, বাংলা ভাষায় কথা বলা মানেই বাংলাদেশি হওয়া। এটা বাস্তব যে অসমীয়া সংস্কৃতির প্রভাব আসামে সবচেয়ে প্রভাবশালী। কিন্তু আসামের জনজীবনে বাঙালি সংস্কৃতিরও ব্যাপক প্রভাব আছে। তাই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতিই রাজ্যের মানুষের কাছে উপযোগী। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। হিমন্তবাবু খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, আসামে বসবাসকারী যে সমস্ত মানুষ আদমশুমারিতে বাংলাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসাবে উল্লেখ করবেন তাঁদের বিদেশি বলে গণ্য করা হবে। আর এইভাবেই আসামে বসবাসকারী বিদেশীদের সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে। তবে যে কথাটি তখন বলে উঠতে পারেন নি তা হল, এইসব বিদেশিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠান হবে !

কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে একটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের ওপর এই আক্রমণ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংহতির চূড়ান্ত পরিপন্থী। ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। চার বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি এখনও শুরু হয়নি। এর কোনও সদুত্তর কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেনি। ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা বন্ধ হোক। আমরা আশা করি উপরোক্ত সরকারগুলির শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

সম্পাদক
শান্তনু দত্ত চৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

একান্ত নিজস্ব অনুগত একজন দালাই লামা চায় চিন

মিলন দত্ত

দালাই লামা শেষপর্যন্ত নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর একজন উত্তরসূরি থাকবেন। ৬০০ বছরের পুরোনো দালাই লামা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা নিয়ে তাঁর বৌদ্ধ অনুসারীদের মধ্যে যে জল্পনা ছিল, তার অবসান হল।

তিব্বতের মানুষের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ, অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন তাঁরা ভবিষ্যতে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বেন। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে যাঁরা দালাই লামাকে অহিংসা, করুণা এবং তিব্বতী সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখেন, তাঁদের কাছেও ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান দালাই লামার আসল নাম তেনজিন গিয়াৎসো। দালাই লামা হল পদবী। তিব্বতীয় বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি দালাই লামার চতুর্দশ পুনর্জন্ম।

তিব্বত এক বিশাল উচ্চ ভূমি। এর আকার প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার সমান। দালাই লামা তিব্বতের জন্য একটা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার দাবিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কারণে তাঁর অনুসারীরা তাঁর প্রশংসা করে থাকেন।

উত্তরসূরি নিয়ে দালাই নামার ঘোষণার পর থেকে চিন তাদের অনুগত একজন দালাই লামা খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত একটি ঘোষিত ধর্মহীন দেশ চিন কেন তিব্বতের ধর্মীয় প্রধান নির্বাচন নিয়ে এত মরিয়া? কারণ যেনতেন প্রকারে চিন তার অনুগত একজন দালাই লামা চায়। তারা মনে করে একজন দালাই লামা ছাড়া তিব্বতিদের বসে রাখা সম্ভব নয়।

দালাই লামার উত্তরসূরী

১৯৫১ সালে চিন সেনা বাহিনী পাঠিয়ে চিনের দখল নেওয়ার পরেও আট বছর দালাই তিব্বতের রাজধানী লাসায় পোটালা প্রাসাদে বাস করেছেন মোটামুটি নিরুপদ্রবে। কিন্তু ১৯৫৯ সালে চীনা সেনারা লাসায় প্রবেশ করার পরে দালাই লামা এবং হাজার হাজার তিব্বতি ভারতে চলে আসেন। শান্তিতে নোবেলবিজয়ী এই ধর্মীয় নেতা এর আগে বলেছিলেন, জনগণ চাইলেই কেবল দালাই লামা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা থাকবে।

গত ১৪ বছরে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে নির্বাসিত তিব্বতি জনগণ, হিমালয়, মঙ্গোলিয়া এবং রাশিয়া ও চিনের কিছু অংশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে দালাই লামা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অনুরোধ পেয়েছেন তিনি। তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের সদর দফতর ধর্মশালায় বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের এক সমাবেশে দালাই লামার দেওয়া একটি ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়। সেখানে তিনি বলেন, 'বিশেষ করে তিব্বতে বসবাসকারী তিব্বতি মানুষের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে আমি এমন অনেক বার্তা পেয়েছি, যেখানে মানুষ একই অনুরোধ জানিয়েছেন। এসব অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিশ্চিত করে বলছি, দালাই লামা প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে।' দালাই লামার বয়স ৯০ পেরিয়েছে। ফলে তিব্বতের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এবং উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে অনেক দিন ধরেই তিব্বতিরা উদ্বিগ্ন ছিল। দালাই লামা তাঁর ৯০তম জন্মদিনের ঠিক আগে নিজের উত্তরসূরি রাখার ঘোষণাটি করেছেন। গত ৬ জুলাই ছিল তাঁর জন্মদিন।

চিন মনে করে দালাই লামা একজন 'বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী'। তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই ধর্মীয় নেতা নিজেকে একজন 'সাধারণ বৌদ্ধভিক্ষু' হিসেবে পরিচয় দেন। নির্বাসিত অনেক তিব্বতির আশঙ্কা ছিল, দালাই লামার মৃত্যুর পর চিন সরকার নিজেই একজন উত্তরসূরি নিয়োগ করতে পারে। এটা করতে পারলে ১৯৫০ সালে সেনা বাহিনী পাঠিয়ে দখলে নেওয়া তিব্বতের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করে কায়েম করতে পারে চিন।

তবে তাঁর ৯০ তম জন্মদিনের আগেই দালাই লামা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, পঞ্চদশ দালাই লামাকে শনাক্ত করার দায়িত্ব শুধু ভারতভিত্তিক গাদেন ফোদরাং ট্রাস্টের হাতে থাকবে। সেটাই দালাই লামার দপ্তর।

দালাই লামা বলেন, 'আমি আবারও বলছি, ভবিষ্যতে দালাই লামার পুনর্জন্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার একমাত্র অধিকার গাদেন ফোদরাং ট্রাস্টের। এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অন্য কারও নেই।'

এই সিদ্ধান্তটি তিব্বতের স্বার্থ রক্ষা করবে বলে মনে করছেন অনেকে। এই ঘোষণার মাধ্যমে বেইজিংকে একটি স্পষ্ট বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তা হল, তিব্বতে ভবিষ্যতের নেতা নির্বাচনে চিনের কোনো ভূমিকা যে থাকবে না , সেটা জোরালোভাবেই জানিয়ে দেওয়া জ্জ ২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা ১ লাখ ৩০ হাজার তিব্বতির ভোটে নির্বাচিত একটি নির্বাসিত সরকারের হাতে দালাই লামা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন।

তবে একই সঙ্গে দালাই লামা সতর্ক করে বলেছিলেন, তাঁর এই আধ্যাত্মিক পদটি নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও 'বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে পুনর্জন্ম প্রথার অপব্যবহার' হওয়ার স্পষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

কে এই দালাই লামা

তিব্বতিরা দালাই লামাকে বুদ্ধের জীবন্ত অবতার বলে মনে করেন। ১৩৯১ সাল থেকে দালাই লামা ১৩ বার 'পুনর্জন্ম' পেয়েছেন। যখন একজন দালাই লামা মারা যান, তখন পরবর্তী দালাই লামার জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়। প্রয়াত দালাই লামার প্রধান শিষ্যরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও দর্শনের ভিত্তিতে নতুন দালাই লামা কে হবেন, তা ঠিক করেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিন সরকার জোর দিয়ে বলে আসছে, পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন, তা শনাক্ত করার অধিকার

শুধু তাদেরই আছে। আর কারও নয়। চিন যে এই প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের কোনও নেতা নির্ধারণ করতে চাইছে, তা নয়।

আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের দিক থেকে দালাই লামার পরই যাঁর অবস্থান, সেই পঞ্চেন লামা (দালাই লামার মতো পঞ্চেন লামাও একটি পদবি) হিসেবে ছয় বছর বয়সী এক বালককে দালাই লামা চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে চিন সরকার সেই পঞ্চেন লামাকে অপহরণ করে। এরপর চিন সরকার নিজেদের পছন্দমাফিক একজনকে পঞ্চেন লামা হিসেবে নিয়োগ করে। বালক বয়সে অপহৃত হওয়া প্রকৃত পঞ্চেন লামা আজ প্রায় তিন দশক ধরে চিনের কারাগারে বন্দী। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় কারাগারে থাকা রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তিনি একজন।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ নেতা ও তিব্বতের কর্মকাগ্যু সম্প্রদায়ের প্রধান আধ্যাত্মিক নেতা কর্মপা শনাক্তকরণেও চীনা হস্তক্ষেপের নজির আছে। তিব্বতের কর্মপা ওগিয়েন ত্রিনলে দোরজে ১৯৯৯ সালে হঠাৎ করে কিছু সঙ্গীসাথিসহ নেপাল হয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। ১৪ বছর বয়সী কর্মপার এত সহজে চিন থেকে পালিয়ে আসাটা ভারতীয়দের মধ্যে সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল। ২০১১ সালে দিল্লি পুলিশ তাঁর বাসস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে চীনা মুদ্রা জধ করার পর অনেকেই তাঁকে চিনের চর বলে সন্দেহ করতে থাকেন।

অনেকের সন্দেহ, ওগিয়েন ত্রিনলে দোরজে আদতে ভারতে পালিয়ে আসেননি, চিন সরকারই পালিয়ে যাওয়ার নাটক সাজিয়ে তাঁকে চর হিসেবে ভারতে পাঠিয়েছে। তাঁর ওপর ভারত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ২০১৮ সালে ভারত সিদ্ধান্ত নেয় চিনের দ্বারা অভিষিক্ত এই কর্মাপাকে তাঁর সম্প্রদায়ের বৈধ প্রধান হিসেবে আর স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

তবে দালাই লামার বিষয়টি চিনের কাছে একেবারে আলাদা। এই পদ চিনের কাছে মহামূল্যবান 'ধবল তিমি'। ১৯৩৫ সালে জন্ম নেওয়া তেনজিন গায়সোরকে ১৯৩৭ সালে মাত্র দুই বছর বয়সে ১৪তম দালাই লামা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল।

১৯৫১ সালে চিন তিব্বত দখল করে নেওয়ার পর থেকে সেই দালাই লামা চিনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। ১৯৮৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত দালাই লামা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে চীনা দখলদারির বিরুদ্ধে তিব্বতীয় প্রতিরোধকে মূর্ত করে তোলেন।

আগে দালাই লামা তিব্বতের শুধু আধ্যাত্মিক নেতাই ছিলেন না, সেখানকার রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। অনেকটা ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ও একজন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মিশেলে তিনি ক্ষমতায়িত ছিলেন। তবে ২০১১ সালে প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এই প্রবাসী সরকার ভারতে ও অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী তিব্বতি শরণার্থীদের দ্বারা পাঁচ বছর পরপর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

দালাই লামা শুধু তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তুলে দেননি; তিনি এই ঘোষণাও করেছেন যে তিনি পুনর্জন্ম না নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যদি ঘোষণা দেন তিনি মানবজীবন নিয়ে পুনর্জন্ম নেবেন না, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে, তিনিই হবেন সর্বশেষ দালাই লামা। তাঁর পরে আর কোনো দালাই লামা আসবেন না। আর সেটি হবে তাঁর এমন এক সিদ্ধান্ত, যা চিনের ঠিক করা যেকোনো দালাই লামার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে।

দালাই লামা ভালো করে জানেন, কোনো দালাই লামা না থাকার তুলনায় সিপিসির অনুগত একজন দালাই লামা চিনের জন্য অনেক বেশি কাজের হবে এবং তিব্বতের জন্য অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হবে।

প্রোস্টেট ক্যানসারের জন্য ২০১৬ সালে দালাই লামার দেহে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ক্যানসার থেকে তিনি 'পুরোপুরি' সেরে উঠেছেন, তবে হাঁটুর সমস্যার সঙ্গে তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

চীনা চাপের মুখে পড়ে ইউরোপের অনেক দেশ এবং এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোসহ (জাপান ছাড়া) বেশিরভাগ দেশ তাঁকে ভিসা দিতে অস্বীকার করে। তবে আমেরিকা দালাই লামাকে সে দেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভারত দাপটের সঙ্গে ৬৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে দালাই লামাকে তাঁর 'সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় অতিথি' হিসেবে উল্লেখ করে এবং তিনিও নিজেকে 'ভারতের পুত্র' হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে তিব্বত ছাড়তে যাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগকেই আশ্রয় দিয়েছে ভারত। এই শরণার্থী তিব্বতিদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং তিব্বতি ভাষায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা দিয়ে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অন্যদিকে চিন তিব্বতের সংস্কৃতি এবং পরিচয় ধ্বংস করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে সি চিন পিং প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসার পর থেকে তিব্বতিদের পরিচয়, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এমনকী তিব্বতের নামটাও তারা বদলে দিয়েছে। তিব্বতের নাম এখন 'শিজাং'। তিব্বত দখল হয়েছিল মাও সে তুঙ চিনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান থাকাকলীন। তারপর থেকে চিন মূল ভূখণ্ড থেকে ক্রমাগত হানদের তিব্বতে নিয়ে গিয়ে স্থানীয়দের জমি দখল করে সেখানে স্থায়ী বাসিল্‌দা করে দিচ্ছে। যাতে তিব্বতিরা একদিন নিজ দেশে সংখ্যালঘু হয়ে যায়। তিব্বতের স্থায়ী দখল নেওয়ার জন্য চিন এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প নিয়েছে।

পরবর্তী দালাই লামাকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে চিনের ছক নস্যাৎ করে দিতে আমেরিকা এবং ভারতের এক হয়ে কাজ করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকা ইতিমধ্যে 'তিব্বতিয়ান পলিসি অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে এবং ২০২০ সাল

থেকে সেটি কার্যকরও হয়েছে। ওই আইনে বলা হয়েছে, ‘১৫তম দালাই লামা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৪তম দালাই লামার লিখিত অসিয়তনামাকে মূল নির্ধারক হিসেবে ধরা হবে। এই আইনে তিব্বতের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার অনুশীলনে হস্তক্ষেপকারী চীনা কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

আরও করণীয় আছে। দালাই লামা নামক ৬০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করতে চিন যে চক্রান্ত করছে, তা নস্যাৎ করতে আমেরিকা ও ভারতকে বহুপক্ষীয় কৌশল প্রণয়নে একযোগে কাজ করা দরকার।

তিব্বতে কি করছে চিন

গত জুন মাসে আমেরিকা চিনের এমন কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যাঁরা তিব্বতের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় পরিচয় মুছে দিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। আমেরিকা তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পদক্ষেপটা নিয়েছে। আরও কিছু দেশ একই পদক্ষেপের দিকে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিব্বতের ১০ লাখ শিশুকে জোর করে চীনা সমাজে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিশুদের তাদের বাড়ি ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন আবাসিক বিদ্যালয়ে মান্দারিন (চিনা) ভাষায় পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দাবি জানিয়েছেন, চিন যেন তিব্বতিদের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মূল করার প্রচেষ্টা থেকে সরে আসে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চিন সরকারের কাছে আমেরিকা দাবি জানায়, তারা যেন তিব্বতি শিশুদের জবরদস্তি করে সরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ানো বন্ধ করে। তিব্বত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অন্যান্য অংশে নিপীড়নমূলক আত্তীকরণ নীতি যেন তারা বন্ধ করে। অন্য অংশ বলতে, মূলত জিনজিয়াং, ইনার মঙ্গোলিয়া ও হংকংয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এসব অঞ্চলের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে আসছে চিন।

১৯৫০ সালে চিন তিব্বতকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। আমেরিকার বিগত বাইডেন প্রশাসন চিনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেয়। এই কারণে তারা বেইজিং যেসব মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করে চলেছে, তা নিয়ে কথা বলতে ইতস্তত করছে না।

তিব্বতি শিশুরা যে মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেটি আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। তিব্বতের জনমিতি বদলে দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই এই নিপীড়ন করা হচ্ছে। তিব্বতিদের ওপর সংস্কৃতির আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া এবং তিব্বতি ঘরানার বৌদ্ধধর্মের চর্চা ও তিব্বতি ভাষার কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্য থেকেই এই নিপীড়ন চলছে।

তিব্বতি শিক্ষাবিষয়ক সমাজতাত্ত্বিক গিয়েল লো বলেছেন, ‘চিন সরকার পরিবারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এই শিশুদের জোর করে তাদের নিজেদের তিব্বতি সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

চলতি বছরে প্রকাশিত জাতিসংঘের আরেকটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন জানাচ্ছে, হাজার হাজার তিব্বতিকে তাদের বাড়িঘর থেকে এবং গ্রামীণ এলাকার কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর তাদের নিম্ন মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবে তিব্বতিদের পরিচয় মুছে ফেলা এবং তাদের প্রথাগত জীবনযাপন থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে।

তিব্বতিদের ওপর বাড়াবাড়ি করার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিধিবহির্ভূতভাবে আটক, নির্যাতন, যৌন অপরাধ, গুম ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বড় ধরনের শাস্তি দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এক অর্থে, তিব্বতে চিরস্থায়ী লকডাউন চলছে। পাসপোর্ট ব্যবহার করে তিব্বত থেকে বাইরে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। বিদেশি গণমাধ্যমকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। চিন চায়, সবাই যেন তিব্বতকে ভুলে যায়।

ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমও সতর্ক করেছে, তিব্বতি বৌদ্ধদের ওপর চিন সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও দমন তীব্র হয়েছে। চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতিদের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, ধর্মীয় সমাবেশের ওপর আরোপিত হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

তিব্বতিদের এই বিপর্যয় আরও তীব্র হতে পারে। তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার উত্তরাধিকারী কে হবেন তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত অজ্ঞাতনামা এক শিশুর নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বেইজিং এখন তাদের পছন্দের প্রার্থীর জন্য চাপ দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে চিন তিব্বতিদের মৌলিক মানবাধিকার যখন পদদলিত করছে, তখন বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো নীরব। সে কারণেই চিন তিব্বতকে মুছে ফেলতে পারছে। কেউই তিব্বতিদের সার্বভৌম অধিকারকে এবং নির্বাসিত তিব্বতি সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

ট্রাম্প সরকারের আদর্শ কি মোদী সরকার?

মানস কুমার লাহা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে সে দেশের নামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর ক্রমাগত নানান চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের প্রশাসন, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে ‘ইহুদী বিদ্বেষ’ কমাতে চাপ দিচ্ছে; তাদের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সামাজিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা বা বজায় রাখার সমস্ত উদ্যোগ নিষিদ্ধ করেছে; এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের

মার্কিন সরকারের নীতির (যেমন গাজার গণহত্যায় ইসরায়েলকে প্রশ্নাতীত ভাবে সর্মথন করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রতিশোধ নিতে তাদের আটক করছে বা নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। এই শর্তগুলি মেনে না নিলে ট্রাম্পের সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোটি কোটি ডলারের সরকারি অনুদান বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছে। যেসব সংস্থা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান যাচাই করে তাদের স্বীকৃতি দেয় তারা নাকি ত্বামপন্থী অধ্যুষিত,দ স্বীকৃতি দেওয়ার সময়ে গুণাগুণের সঠিক বিচার করে না, ছাত্র ভর্তির সময়ও নাকি একই ঘটনা ঘটে , অতএব এই মান যাচাই সংস্থাগুলিকেই তাড়িয়ে দিয়ে নতুন সংস্থা নিয়োগ করার কথা ভাবছে ট্রাম্প সরকার ! (১)

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের এসব আধার মেনে নিয়েছে। হার্ভার্ড নেয়নি, প্রশাশনের বিরুদ্ধে তারা আদালতে গেছে। এর প্রতিঘাতে ট্রাম্প সরকার হার্ভার্ডে বিদেশি ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে বিদেশি ছাত্রদের মাইনে ইত্যাদি বাবদ যে ভালো আয় হতো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের, তা বন্ধ হয়েছে। আদালতে নিষ্পত্তি কী হবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে। তবে, মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই অবস্থা দেখে সেদেশের ও পৃথিবীর আরও অনেক দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষব্রতী সমাজ চিন্তিত। তার একটি প্রধান কারণ এই যে, বেছে বেছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর এই আঘাত নেমে আসছে তাদের মধ্যে কিছু অতি উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যায়তন আছে, যেখানকার গবেষণার মান বিশ্বের একেবারে প্রথম সারির। শুধু তাই নয়, এগুলি মুক্ত চিন্তা ও তৎসংশ্লিষ্ট তর্ক বিতর্কের পীঠস্থানও বটে। একদিকে মুক্ত চিন্তা এবং তার ধারক ও বাহকদের ট্রাম্পের মত জনরঞ্জনবাদী নেতারা সবসময়ই ভয় করেন। আর অন্যদিকে, এই নেতাদের সমর্থক গোষ্ঠী মনে করেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতারা তাঁদের বোঝানও, যে মুক্ত চিন্তা উচ্চশিক্ষিত উন্নাসিক লোকেদের এক বিলাসিতা যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এর থেকে বোঝা যায় ট্রাম্প কেন হারভার্ড বা কলম্বিয়ার মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর খড়্গহস্ত।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের কীর্তিকলাপের এখানেই শেষ নয়। মার্কিন দেশে থাকা সমাজের নিচু স্তরের (হয়ত অবৈধ) অভিবাসীদের কারাবন্দি বা দেশান্তরিত করার কাজও আরম্ভ হয়েছে। এব্যাপারে মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের দিকে বিযেশ নজর দেওয়া হচ্ছে। কয়েকমাস আগে কয়েকশ এরকম ভারতীয়দের হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ি পরিয়ে প্লেনে করে এদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ যেখানে কাজ করেন, যেমন পেট্রোল পাম্পে, ছোট দোকানে বা খামারে, সেই সব জায়গায় অতর্কিতে হানা দিয়ে তাঁদের তুলে নিয়ে কারাবন্দি করা বা দেশান্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার মত ঘটনা এখন ব্যাপক। এঁদের মধ্যে যারা মার্কিন আইন অনুযায়ী অপরাধী বলে চিহ্নিত তদের জন্য গুয়ান্তানামো বে দ্বীপের সেই কুখ্যাত কারাগারটিকে পুনরায় ব্যবহার করার কথাও ভাবা হচ্ছে, যেখানে বন্দীদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয় এবং বিভিন্ন আইন বহির্ভুত উপায়ে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। এর প্রতিবাদে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে অনেক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়ে চলেছে।গু২গ্ন ডেমোক্র্যাট শাসিত ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের লস অ্যানে্জেলেজ্ শহরে এরকম প্রতিবাদ দমন করতে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাদেশিক সরকারের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ট্রাম্প সরকার সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়েছিল। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ট্রাম্প যেসব জনগোষ্ঠীর সমর্থনে এবারের ভোটে জয়ী হয়েছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ এই শ্রেণীর অভিবাসীদেরকে রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। তাই ট্রাম্প এই শ্রেণীর অভিবাসীদের তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

অস্থায়ী অভিবাসীদের, বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসীদের, সন্তানদের বেলায় জন্মসূত্রে মার্কিনি নাগরিকত্বের অধিকারও কেড়ে নেওয়ার কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন। অথচ, এক সময় মার্কিনীদের বলতে শোনা যেত যে তাঁদের দেশে সবাই অভিবাসী !

এদিকে, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এহেন সঙ্কট দেখে ভারতেও কিছু মানুষ চিন্তিত। এঁরা মূলতঃ সেই শ্রেণীর যাঁরা, বা যাঁদের সন্তান সন্ততিরা, সেখানে গিয়ে সেখানকার কোনও বিস্ববিদ্যালায়ের উপাধি অর্জন করতে চান এবং সম্ভব হলে সেখানেই থেকে যেতে চান; অথবা ইতিমধ্যেই সেখানে আছেন। তার উপর যে কিছুসংখ্যক ভারতবাসী অবৈধ ভাবে মার্কিন দেশে প্রবেশ করার কথা হয়তো ভাবছিলেন তাঁরাও চিন্তিত।

উপরিউক্ত শ্রেণীর লোকজন ছাড়া আম ভারতবাসী মার্কিন মুলুকের ঘটনাবলী নিয়ে বোধহয় বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না, এবং সেটাই হয়ত স্বাভাবিক। তবে, উপরের কথাগুলো পড়ে যদি কারও মনে হয় যে আরে, এইসব ঘটনা খুব চেনা চেনা লাগছে তো ! তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এইরকম ঘটনাবলী অবাধে হয়ে চলেছে আমাদেরই দেশে। এই সময়ে স্কুলশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভয়ের উপরেই ক্রমাগত চরম আঘাত হানা হচ্ছে। আঘাত হানা হচ্ছে সংখ্যালঘু, নারী, সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণী ও বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের উপর। সংবিধানকে ব্যবহার করেই সংবিধানের পরিকাঠামো ধংস করে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার কথা দিয়েই আরম্ভ করা যাক। কোভিড কালে ছাত্রদের পড়াশোনার বোঝা হাল্কা করার অজুহাতে স্কুলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় ছেঁটে ফেলে তা আমূল বদলে দেওয়া হচ্ছে। এন.সি.ই.আর.টি.র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে প্রায় আটশ বছরের মুসলিম শাসনকালের বিশদ আলোচনা দুর অস্ত, উল্লেখও নেই। পরিবর্তে ‘ভারতীয়’ ইতিহাস - অর্থাৎ মূলতঃ প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক ‘ইতিহাস’ - পঠনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সে ইতিহাসের প্রভাব বর্তমানের উপর যতই ক্ষীণ হোক না কেন। সমাজবিজ্ঞানের বইয়ে জাতিভেদ প্রথার গুণগান করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে এটি সমাজকে সুশৃঙ্খল করে। সাম্প্রতিক কালের গুজরাট জাতিদাঙ্গা ও নরহত্যার সব উল্লেখ সযত্নে বাদ দেওয়া

হয়েছে এই যুক্তিতে যে এহেন কাণ্ডের বাস্তব বিবরণ সুকুমারমতি ছাত্রদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে! (৩)

পদার্থবিদ্যার পাঠ্যক্রমে বেশ কিছু বুনিয়াদী সূত্র, যেমন শক্তি সংরক্ষণের সূত্র, বাদ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষায় বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে। (৪) এন.সি.ই.আর.টি.র পাঠ্যক্রম যেহেতু দেশের অনেক স্কুল শিক্ষা পর্ষদই মেনে চলে তাই এই পাঠ্যক্রমে এহেন তুঘলকি কাটাছেঁড়া স্কুল শিক্ষার মানের উপর প্রচন্ড বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। লক্ষণীয় যে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যক্রমে এই ছেঁটে দেওয়া অংশগুলিও কিন্তু আছে, যার ফলে এই সব প্রবেশিকা পরিক্ষায় সফল হতে ইচ্ছুকদের আরও বেশি পরিশ্রম করে স্কুল শিক্ষার এই ফাঁকগুলো পূরণ করে নিতে হচ্ছে। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে তভারতীয় জ্ঞান রীতিদ নামক এক ছদ্মবিজ্ঞানের প্রবর্তন করা হচ্ছে। তসবই ব্যাদে আছেদ গোছের ধারণার পুনরুজ্জীবনের বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থাও খারাপের দিকে যাচ্ছে। শিক্ষা যদিও আমাদের সংবিধানের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়, অর্থাৎ রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের যৌথভাবে এক্ষেত্রে কাজ করার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু তা মানছে না। তাদের বক্তব্য যে যেহেতু টাকা তারা দেয় তাই খবরদারি তারাই করবে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার ক্রমশ হরণ করা হচ্ছে। আগে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ছিল কী কী পাঠ্যক্রম তারা চালু করবে। কিন্তু নূতন শিক্ষানীতি - যেখানে সমগ্র দেশে পঠনপাঠনের ধরন একই হবে - প্রবর্তন করে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তেমনই, এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে রাজ্য সরকারের মনোনয়নই চূড়ান্ত বলে গণ্য হ'ত, রাজ্যপালের সম্মতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল মাত্র। কিন্তু এখন বিরোধী রাজনৈতিক দল শাসিত রাজ্যগুলিতে

রাজ্যপালেরা এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছেন। এই সব রাজ্যে নানা অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনেক রকমের ছাত্রবৃত্তি দিয়ে থাকে যার সাহায্যে আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্ররা গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষা, যা নাকি সময় ও খরচসাপেক্ষ, চালিয়ে যেতে পারে। ইদানিং এই ধরনের ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে অনেক ছাত্রকেই গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষা লাভের থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। সব চেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন তফসিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্ররা।

আবার সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান না দিয়ে দশ বছরে পরিশোধযোগ্য ধার নিয়ে কাজ চালাতে বাধ্য করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। কী স্কুলে, কী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাপক হারে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করে দিতে চাইছে।

আজকের ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রখর বাস্তব। বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার চালানো, তাদের দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া, যে কোনো অজুহাতে তাদের ঘর বাড়ি সম্পত্তি ধুলিস্মাৎ করে দেওয়া, তাঁদের বিরুদ্ধে ভুয়া আইনি প্রক্রিয়া করে কারারুদ্ধ করে রাখা, এমনকি মেরে ফেলা , আজকের ভারতে আকছার ঘটে চলেছে। এর সঙ্গে মিশেছে বাংলার বাইরে, বিশেষ করে যে সব রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কায়েম আছে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া এবং প্রায়শঃই বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্বেও চট্ জলদি আন্তর্জাতিক সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়ার মত ঘটনা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মন্ত্র আওড়ানো আজকাল প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অনুচরদের প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যেসব নির্যাতিত মানুষ নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এদেশে আশ্রয়ের খোঁজে আসছেন তাদের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত অকুটুম্বসুলভ আচরণ করছি। মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গ্যা শরণার্থীরা এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান শাসকদলের সমর্থকদের খুশি করার জন্য, ও প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সেই সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতেই যে সংখ্যালঘুদের উপর এই আক্রমণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, আমরা দেখছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমাদের দেশ ভারতের শাসকদের মধ্যে কার্যপ্রণালীর এক লক্ষণীয় সাদৃশ্য ও সমান্তরালতা আছে। এটা বোধহয় শুধুই কাকতালীয় নয়। দু দেশেই ক্ষমতায় থাকা সরকার কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন দেশে যেমন এদেশেও সেরকম, ইজরায়েল গণহত্যার মত জঘন্য অপরাধ করে গেলেও তার কোনো সমালোচনা বরদাস্ত করা হচ্ছে না। কেউ তা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে দু'দেশেই মিশেছে জনরঞ্জনবাদী নেতৃত্বের প্রভাব। যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে, সেই শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বলে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট দুই সরকারই। নিজেদের শাসনের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে নিজেদেরই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সমস্ত সমস্যার কারণ হিসেবে দায়ী করতে দুই সরকারই সচেষ্ট। তাই, ট্রাম্প সরকারের আদর্শ যদি মোদী সরকার নাও হয়, এটা কিন্তু নিশ্চিত যে এই দুই সরকার একই পথের পথিক। আর, শাসকের এই মনোভাব শুধু ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আজ কী ধনী কী নির্ধন, পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে। কেন দক্ষিণপন্থার এরকম জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশকে, সেটা ভাবার বিষয়। এ কি পুঁজিবাদের সাম্প্রতিকতম সঙ্কটের ইঙ্গিত?

(লেখক খড়্গপুর আই.আই.টি.র প্রাক্তন অধ্যাপক।)

এলোমেলো কথা

আমার বন্ধু সুচেতনাকে দিলাম এ লেখা কারণ সে রবীন্দ্রনাথের ইরান নিয়ে লেখা এই কবিতা উদ্ধৃত করেছে

শুভ বসু

মন্ট্রিয়ালে গ্রীষ্মবকাশে প্রকৃতি বড় সুন্দর। নীল আকাশ, সোনালী রোদ্দুর আর আন্দোলিত মন্ট্রিয়াল শহরের জমি দিগন্তে সেন্ট লরেন্স নদীতে মিশে গিয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। কেমন যেন মন বলছে পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু সময় নেই। জীবনের রুজি রোজগারের তাড়না, বই লেখার চাপ আর সংসারের কাজ কর্ম সবই কেমন যেন পথে বের হবার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তবু পথের ডাক আসে।

অনেক দিনের শখ ছিল ইস্তাম্বুল-কায়রো যাবো কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এখন রণভূমি। পুরোনো সভ্যতার আবরণ ধীরে ধীরে মিসাইল আর বোমার আঘাতে খসে পড়ছে। আজকে হঠাৎ মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পারস্য দেশে মরুভূমিতে বেদুইন তাঁবুতে বসে ---

'বাংলা দেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম, সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলের মনই সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুইন-দলপতি যখন বললেন ' আমাদের আদি গুরু বলেছেন যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ 'মুসলমান' 'তখন সে কথা মন কে চমকিয়ে দিলে।'

রবীন্দ্রনাথ পারস্যের প্রথম পরিচয় লেখেন পারস্য যাত্রা বলে প্রবাসী পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যাই ১৩৩৯ সালে। পরে তা পারস্য-জাপান যাত্রা বলে বইয়ের আকারে বের হয়। পারস্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হয় ১৩৩৯ এর ২৫ বৈশাখ। তাঁর জন্মদিনে ইরানীরা নানা বর্ণের ফুলে ফুলে ভরে দিয়েছিলেন ।ফুলের মধ্যে ছিল গোলাপের প্রাধান্য। ইরানের সরকারের কাছ থেকে এসেছে পদক ও ফরমান। বিকেলে নিমন্ত্রণ ছিল শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর বাসভবনে। সেখানে দেশের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা। আবেগতাড়িত রবীন্দ্রনাথ একে মনে করছেন নিজের দ্বিতীয় জন্ম হিসেবে। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯,এ লেখা একটি কবিতায় তিনি এই দিনটির আবেগকে রেখেছেন। 'পারস্যে জন্মদিন' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখলেন

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশি কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনলো তাহার অভিনন্দন বাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়,অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশি কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।
ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হলো কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিব ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক
ইরানের জয় হোক।

এখন মুখবইতে অনেক পন্ডিত পন্ডিতি ফলাচ্ছেন। বাংলাদেশে তাঁদের আধিক্য বেশি। এ নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু একটি কথা না বলে পারছি না। প্রতীচ্যে রবীন্দনাথের সময়ে ইরান কে Persia বলতো ১৯৩৬ সালে রেজা শাহ বিদেশিদের বলেন ইরান নাম লিখতে। আর্য্য থেকে ইরান শব্দটা এসেছে। এক সময়ে পারস্য রাজবংশ ইরানের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁদের থেকেই পার্সিয়া নাম ছড়িয়ে পরে । প্রসঙ্গত সেই সময় কবি ইরাকে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে বলেন -- 'সাম্প্রদায়িকতার অতি কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই ধর্ম আধুনিক যুগের সর্বজনীনতার বাণী ঘোষণা করেছে। এ কখনোই সম্ভবপর হতো না যদি সম্পূর্ণভাবে এ জাতির মন সনাতনী জড়তার পাথর চাপা মন হত।'

আজকে কেন জানি মনে হলো বৃদ্ধ কবির কথা। ভারতে রবীন্দ্রনাথ কে পুজোর বেদিতে বসালেও তার বাণী ভুলে গেছে আর বাংলাদেশে আজকে রবীন্দ্র বিরোধীরা মিথ্যা প্রচার করেন তিনি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। পৃথিবী আজ বড় অশান্ত।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

ইজরায়েলের পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি হয়ে ওঠার পথে অনেক বাধা

সৌর বসু

মধ্যপ্রাচ্যে ১২ দিনের যুদ্ধে ইজরায়েলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেছে। ছোট্ট দেশ ইজরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতা কায়েম করার জন্য অন্য দেশগুলোর সঙ্গে তারা বহুদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। হলে ইজরায়েলের সামরিক অবস্থান বেশ দুর্বল। আমেরিকার মদদ না থাকলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। আমেরিকার সমর্থন নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করার পর ইজরায়েলকে বাস্তবিক পঘক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার জন্য। যদিও পশ্চিমি রক্ষণশীল সংবাদ মাধ্যম এ কথা স্বীকার করতে

নারাজ।ফক্স নিউজ বা নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা কথাই বারবার বলছে যে ইরানের পরমাণু প্রক্রিয়া বন্ধ করার ব্যাপারে ইজরায়েল ব্যর্থ হয়েছে। ইজরায়েলের আক্রমণের আগেই ইরান তার ইউরেনিয়াম ডিপোজিট স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ একথা স্বীকার করেছে। পাশাপাশি মার্কিনী গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছে যে ইরান তার সাত শতাংশ ইউরেনিয়াম মজুদকে অস্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এরকম কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই। অন্যদিকে ইরানের কাছে পর্যুদস্ত হবার পরও, ইজরায়েল গাজা ভূখণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

সম্প্রতি নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা আসার পর নেতানিয়াহুর তৃতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং ইজরায়েল - ইরান ১২ দিনের যুদ্ধের পর নেতানিয়াহুর এটি মার্কিন দেশ সফর। এই সফরে গিয়ে নেতানিয়াহু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে বলেন, ট্রাম্প পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেজন্য তাকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করার ব্যাপারে নেতানিয়াহু আগ্রহী। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে একটি চিঠি তুলে দেন যেখানে নেতানিয়াহু প্রস্তাব করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কার দেবার। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের আর্মি চিফ আসিম মুনির ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক মদত জুগিয়ে চলেছেন , সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে যে ,তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করার জন্য নোবেল পুরস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছে।এটি একটি অভিনব এবং হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতানিয়াহু উপস্থিত হবার পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন যে হামাসের সঙ্গে ইসরাইলের একটি চুক্তি সম্পাদিত করার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে স্থানচ্যুত করার প্রশ্নে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন যে, তিনি পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে যে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী, অমানবিক এবং গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করার সমতুল। পশ্চিমের কিছু রাষ্ট্র এবং আরব নেতারা ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে নির্মূল করার প্রক্রিয়াকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরমতম নিদর্শন বলে অভিহিত করেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনিদের ওপর যে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ এবং অত্যাচার করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে তিনি ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি ভূখণ্ড নির্বাচন করেছেন যেখানে তারা সচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। কিন্তু সেখানে তাদের উপর ইজরায়েলের সেনাদের নজরদারি অব্যাহত থাকবে। ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থাকে বাস্তবিক পক্ষে concentation ত্বথদ্বদ্ম বলে নিন্দা করেছেন।

সম্প্রতি লন্ডনে একটি বক্তৃতায় বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ Dalrymple ফিলিস্তিনিদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এত বড় অপরাধের ঘটনা কোথাও ঘটেনি। গাজা থেকে ৭০ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের ইজরায়েল কর্তৃক উৎখাত করার যে ঘটনা তাকে তিনিBiggest moral catastrophe বলে উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে ভারত বর্ষ এখন ইজরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করেছে।

তিনি বলেন ৭৫ লক্ষ প্যালেস্টাইনবাসীকে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে বলাৎকার করে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। ইউরোপে নাৎসীরা যেভাবে ইহুদিদের উপর অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, আজ ইহুদিরা একই রকম ভাবে বোমা বর্ষণ করে গুলি চালিয়ে নির্বিচারে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের হত্যা করে, জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করছে।

বস্তুত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মুখে বলছেন পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপে এবং অন্যত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা, কিন্তু বাস্তবে তিনি মদত দিয়ে চলেছেন ইজরায়েলের মত যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রকে। অন্যদিকে ইরান এবং ইরানের পক্ষাবলম্বী পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ইজরায়েলকে পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে দেবে না। তাছাড়া বর্তমানে ইরান রাশিয়া এবং চিন মিত্র শক্তি। রাশিয়া ইরানের পক্ষে মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ছে বটে তবে চিন এখনো নিশ্চুপ থেকে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চিন এবং রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত আছে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে ইরান আক্রান্ত হলে রাশিয়া এবং চিন ইরানের পক্ষ নিতে পারে। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত থাকা সত্ত্বেও ইজরায়েলের পক্ষে পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠা সম্ভবপর নয় বলেই মনে হয় ।

এখন বাংলাদেশ

প্রজন্ম চত্বর ভেঙে ফেলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলা হচ্ছে

তসলিমা নাসরিন

শাহবাগের ‘প্রজন্ম চত্বর’ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কারণ ইউনুস সরকার প্রজন্ম চত্বরের কোনও স্মৃতি রাখতে চায় না। ২০১৩ সালে গণজাগরণ আন্দোলনের সময় শাহবাগে গড়ে ওঠা ‘প্রজন্ম চত্বর’ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির প্রতীক হয়ে ওঠে। ভাস্কর্যটি ওই আন্দোলনের স্মৃতি ধরে রেখেছিল।

’প্রজন্ম চত্বর’ ভেঙে প্রজন্ম চত্বরের জায়গায় জুলাইয়ের স্মৃতিতে ভাস্কর্য গড়া হবে। জুলাই জোদ্ধারা জামাতিজিহাদিজঙ্গি। তারা ভাস্কর্য বিরোধী, তাদের তো ভাস্কর্যের লোভ করা উচিত নয়! তাছাড়া

জুলাইকে কেন এত স্মরণীয় করা দরকার? আন্দোলন করে কোনও সরকারকে সরিয়ে দেওয়া কোনও অভিনব ঘটনা নয়। পৃথিবীর বহু দেশে বহুবার ঘটেছে। এমনকী বাংলাদেশেও ঘটেছে। আন্দোলন করে এক সময় স্বৈরাচারী এরশাদকেও নামানো হয়েছিল। কোনও সরকার পতনের আন্দোলনই মহান নয় বা প্রশংসার যোগ্য নয়, যদি না আগের সরকারের তুলনায় মাচ মাচ মাচ বেটার সরকারকে ক্ষমতায় আনা যায়। হাসিনা সরকারের ভুলত্রুটি বর্তমান সরকার সামান্যও সংশোধন করেনি, বরং ভয়াবহ ভুলত্রুটির ডোবায় দেশকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে অরাজকতা, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, নিরাপত্তাহীনতা, লুটতরাজ, দুর্নীতি ইত্যাদি উদ্বাহু নৃত্য করে চলেছে। জুলাই এর জন্য আলাদা করে কিছু বানাতে হবে না কোথাও। দেশের মসজিদ আর মাদ্রাসাই জুলাই আন্দোলনের প্রতীক। মসজিদ মাদ্রাসা থেকেই অধিকাংশ লোক বেরিয়ে এসে জুলাইয়ের জিহাদি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং মসজিদ মাদ্রাসার গায়ে জুলাই চিহ্ন সেঁটে দিলেই হবে।

আমাদের আর ভাল কিছু হলো না। এক কালো অধ্যায় গিয়ে আরেক কালো অধ্যায় আসে। এক কালো সরাতে গিয়ে আমরা আরও ঘোর কালোর খপ্পরে পড়ি। ভালো বুঝি 'ভাগ্যে' নেই। নির্বাচনের পর যা আসবে, তাও কি আদৌ পাতে দেওয়ার মতো হবে? মনে তো হয় না।

মব লিনচিং নৃশংস গণহত্যা ও বাংলাদেশ

সুষুপ্ত পাঠক

হঠাৎ দেশে মানবাধিকারবাদী মানুষের ঢল দেখে একটুও অবাক হইনি। প্রকাশ্যে রাস্তায় একজন ব্যবসায়ীকে পাথর মেরে হত্যার মত বা তারচেয়ে নৃশংসভাবে হত্যা গত এক বছরের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হয়েছে। পুলিশের উপর হয়েছে। সেই হত্যার দৃশ্য দেখে আপনাদের মনে হয়েছে এগুলো জনগণের ন্যায় সংগত ক্ষোভ! বৈষম্য বিরোধী তথা এনসিপির মব গুন্ডা বাহিনীর নৃশংসতা আপনাদের খারাপ লাগেনি কারণ ওগুলো আওয়ামী লীগের উপর হয়েছে। এখন নৃশংসতা করেছে যুবদলের কর্মী। সামনে নির্বাচন হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। বিএনপি কত খারাপ এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সারাদেশে বিএনপি কর্মীদের করা নৃশংসতা, চাঁদাবাজি অবাধে হতে দিচ্ছে সরকার যাতে সরকারি দল এনসিপি বলতে পারে বিএনপি খারাপ আমরা ভালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে উত্তাল হয়েছে মিডফোর্ডের ঘটনায়। এরাই তো মেরে মেরে লাশ ঝুলিয়ে রাখতো! আপনারা বলতেন দেশে বিপ্লব হলে পরিস্থিতি একটু এরকমই হয়! সেই মন্থরার মুখে একী কথা শুনি আজ!

শুধু মাত্র আওয়ামী লীগ করলেই যদি তার বাড়ি লুট হওয়া বৈধ, আওয়ামী লীগ করলেই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে, আজকেও একজন যুবলীগের নেতাকে মেরে ফেলেছে, এমনকি যুবদলের একজনকে পায়ের রগ কেটে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু মিডফোর্ডের ঘটনায় পলিটিক্স আছে !আপনাদের মানবতা যে রাজনৈতিক আর ধর্মীয় সেটা কি নতুন কিছু ? দশ হাজার ফিলিস্তিন মেরেছিল জর্ডান পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে। এক লক্ষ মেরেছে ইয়েমেনে সৌদি আরব। ইরান গুম করেছে হাজার হাজার হিজাব আন্দোলনের সময়। কিন্তু মানবতার প্রশ্ন শুধু ইসরায়েলের হামলার সময় তুললে হবে ! চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এক বিএনপি নেতা। সেই মামলায় সরকার গ্রেফতার করে চিন্ময় কৃষ্ণকে আর জামিন দেয়নি। পয়েন্টটা খেয়াল করেন। এখন যুবদলের কর্মী দিয়ে নৃশংস হত্যা করিয়ে পুরো এনসিপি ইস্যু নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে! তারেক জিয়ার রাজনীতি শেখা হয়নি কোনদিন হবেও না !

বিহারে এস আই আর তিন কোটি মানুষের ভোটাধিকার হরণের আশঙ্কা

শুভাশিস মজুমদার

বিহারে নির্বাচন কমিশনের এস আই আর (স্পেশাল ইনটেনশিভ রিভিশন) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন কে কেন্দ্র করে উঠে এলো ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ। ১৪ ও ১৫ জুলাই পাটনা ও বেগুসরাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক ভাস্কর সংবাদ পত্রে এই নিয়ে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদ পত্র ১০০ র বেশি সাংবাদিক নিয়োগ করে অনুসন্ধানমূলক গ্রাউন্ড রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। হিন্দিতে সংবাদের শিরোনাম - 'অবৈধ ওয়াসুলি, রিসিভিং নহি... বিএলও কনফিউজ (১৪ জুলাই)' এবং ভোটারসে মিলে হস্তাক্ষর ওয়া দস্তাবেজ লিয়ে ঔর আপলোড কর দিয়ে গণনা পত্র (১৫ জুলাই)।' কোথাও ফর্মের অভাব, কোথাও প্রাপ্তি স্বীকারের রশিদের অভাব। কোথাও অনলাইনে ফর্ম আপলোড করার জন্য বিএলও-র বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। সাংবাদিক অজিত অঞ্জুম এবং রাজীব রঞ্জন সিংয়ের ভিডিও রিপোর্টিংয়ে (ইউটিউবে) বিহারে এস আই আর প্রক্রিয়ার বেপরোয়া অনিয়মের ছবি উঠে এসেছে।

এই প্রক্রিয়ার নিয়ম অনুযায়ী নিযুক্ত বিএলও-দের তাঁর এলাকার প্রতিটি পরিবারে ব্যক্তিগত ভাবে গিয়ে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করার কথা। সাধারণত স্কুল শিক্ষকদের বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা হয়। প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে নির্ধারিত নথি ও সাম্প্রতিক ছবি সংগ্রহ করে নির্ধারিত ফর্মে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া বিএলও-দের কাজ। এই সময়ে দ্বিতীয় একটি নির্দিষ্ট ফর্ম প্রাপ্তি স্বীকারের রশিদ হিসাবে ওই যোগ্য ব্যক্তির হাতে বিএলও-র তুলে দেওয়ার কথা। সাংবাদিকদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএলও ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের কাছে যাচ্ছেন না, যেখানে প্রয়োজনে

(কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে) বিএলওকে তিনবার পর্যন্ত যেতে হতে পারে। প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই প্রাপ্তি স্বীকারের রশিদ- (দ্বিতীয় ফর্ম)টি দেওয়া হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছবি বা বৈধ নথি ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে অসম্পূর্ণ ফর্ম আপলোড করা হচ্ছে প্রক্রিয়া সত্বর সম্পূর্ণ করার জন্য। এতে বহু মানুষ ভোটাধিকার হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা। অভিযোগ ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার চাপ ডিএম, এসডিও, বিডিও এবং বিএলও - সকলের উপরেই আছে। তবে সব থেকে নাজেহাল হচ্ছেন বিএলও-রা। তাঁদের অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন, যে কাজে কম পক্ষে ৬ মাস লাগার কথা তা মাত্র ১৫-২০ দিনে সম্পূর্ণ করতে বলা হচ্ছে। কাজের অগ্রগতি ঠিক মত না হওয়ায় প্রায় দুশো জন বিএলও-র বেতন আটকে রাখা হয়েছে।

সাংবাদিক অজিত অঞ্জুম অভিযোগ করেছেন, অনুসন্ধানমূলক ভিডিও রিপোর্ট তৈরি করার সময়ে তাঁকে ফোন করে সরকারি আধিকারিকরা ভিডিও প্রকাশ করতে নিষেধ করেন এবং এর পরে বেগুসরাইয়ে একজন বিএলও তাঁর বিরুদ্ধে ‘সরকারি কাজে বাধা দানের’ অভিযোগে এফআইআর করেছেন।

ইলেকশন কমিশনের ২৪ জুন ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় ২২ বছর পর বিহারে এই ধরণের স্পেশাল রিভিশন হচ্ছে। এস আই আর আদেশকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করার দাবিতে দায়ের করা এক মামলায় ১০ জুলাই,বৃহস্পতিবার, সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য আধার কার্ড, ভোটার আই-কার্ড এবং রেশন কার্ডকে পরিচয়পত্রের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হোক।

গ্রাউন্ড রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে বিহারের গ্রামের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে এই তিনটি নথি ছাড়া ইলেকশন কমিশনের নির্দিষ্ট করা অন্য নথি নেই। নির্বাচন কমিশন এই তিনটি নথি বাদ দিয়ে ১১টি অন্যান্য শ্রেণীর নথিকে পরিচয়পত্রের প্রমাণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে, যার ফলে বিরোধী দল এবং মানব অধিকার গোষ্ঠীগুলি অভিযোগ করেছে যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এস এই আর ৩ কোটিরও বেশি ভোটারের, বিশেষ করে প্রান্তিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। আদালত স্পষ্ট করে বলেছে যে এই তিনটি নথি বিবেচিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ জানানো উচিত।

‘যদি আপনার বাতিল করার উপযুক্ত কারণ থাকে, তাহলে আপনি বাতিল করতে স্বাধীন, তবে আপনাকে কারণ জানাতে হবে,দ বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ ইলেকশন কমিশনের পক্ষের অ্যাডভোকেটকে বলেছেন। আধার নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেঞ্চ মন্তব্য করে যে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন নয়। আধার বাদ দেওয়ার যুক্তি নিয়ে এই কারণেও প্রশ্ন ওঠে, কমিশনের ১১টি নথির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত জাতিগত শংসাপত্র পেতে একজন ব্যক্তিকে তাঁর আধার কার্ড পরিচয়পত্র হিসেবে প্রদান করতে হয়। বিহারে নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে এই প্রক্রিয়া কেন চালু করা হলো তা নিয়েও বেঞ্চ মন্তব্য করেছে।

এর পরবর্তী শুনানির জন্য ২৮ জুলাই তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে তার পাল্টা হলফনামা দাখিল করতে হবে। আদালত এখন নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষা করবেনির্বাচন কমিশনের এস আই আর গ্রহণের ক্ষমতা ।যে পদ্ধতিতে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা’ যথার্থ কিনা। খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি, আপত্তি চাওয়ার জন্য এবং চূড়ান্ত তালিকা তৈরির জন্য প্রদত্ত মোট সময় নভেম্বরে বিহার নির্বাচন হওয়ার কারণে খুবই কম। নাগরিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষে কাজ করা গোষ্ঠী এবং বেশ কয়েকটি বিরোধী দল কমিশনের ২৪ জুনের এস আই আর জারির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন দাখিল করেছে।

তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে কোটি কোটি দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোটার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আই.ডি প্রমাণপত্র উপস্থাপন করতে অক্ষম হবেন এবং ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ পড়বে। আবেদনকারীরা তালিকা থেকে আধার এবং রেশন কার্ড বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ ভাবে তুলে ধরেছেন। আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং অভিষেক মনু সিংভি; নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী এবং মনিন্দর সিং।

কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১১টি শ্রেণীর নথির মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, জন্ম শংসাপত্র, স্কুল বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত শংসাপত্র, সরকারি বা পাবলিক ইনভেস্টিগেশন আই-কার্ড বা পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, জাতিগত শংসাপত্র, জমি বা বাড়ি বরাদ্দ শংসাপত্র, স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র এবং বন অধিকার শংসাপত্র।

আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস এবং পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ। কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি, সিপিআই, সিপিএম, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব) এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা যৌথভাবে আরেকটি আবেদন দায়ের করেছে।

আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মতো ব্যক্তিরাও নির্বাচন প্যানেলের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে, বিরোধী দল গুলি নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করলে বিজেপি এর তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাচ্ছে। বিরোধী দলগুলির মতে যা কমিশন ও বিজেপির মধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক আঁতাতকে দেখিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের আর এক মন্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিশেষ সূত্র মারফত নির্বাচন কমিশন নাকি জানতে পেরেছে যে বিহারে বহু বিদেশি অনুপ্রবেশকারী অবৈধ ভাবে বসবাস করছে। বিরোধীদের মন্তব্য, এটা সত্যি হলে এর দায় তো বিজেপি ও তার সহযোগী দল দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপরেই বর্তায়, কারণ তারাই দীর্ঘ দিন ধরে শাসন ক্ষমতায় আছে।

বিহারের নির্বাচনে জনজাতি, দলিত ও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়ে বিজেপিকে জয়ী করার ছক

অমিতাভ সিংহ

নীতিশকুমার বিজেপির নৌকায় ওঠার পর বিহারের অপরাধের সংখ্যা দিন দিন যে বেড়ে চলেছে শুধু তাই নয়, এরাজ্যে দলিত, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও ক্রমবর্ধমান। বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে গুন্ডামিকে পেশা করছে যুবকেরা । কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছেন বিহারে গত ১১ দিনে ৩১ টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুর্ণিয়ায় জনজাতি পরিবারের পাঁচজনকে ডাইনী সন্দেহে খুনের ঘটনার প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুত বিহার এখন বিজেপি ও জেডি(ইউ) নেতাদের দুর্নীতি ও অপরাধের স্বর্গরাজ্য। ঠিক এই সময়ে রাহুল গান্ধি ও আর. জে.ডি'র তেজস্বীর যুগলবন্দী বিজেপি ও আরএসএসের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। এই বছরের শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। গত নির্বাচনে বিহারের ভোটাররা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও ভোট গণনায় কারচুপি ও নীতিশকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় বিজেপি মাঝপথে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান এই এনডিএ সরকারের অযোগ্যতায় এবার নির্বাচনে তাদের জয় দূর অস্ত। ফলে তাদের বেআইনীভাবে ও বিজেপির আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় মাত্র দুমাসে প্রায় আট কোটি ভোটদাতাদের তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের ইচ্ছা।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৩ সালে এই ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন হয়েছিল, সময় লেগেছিল দুবছর। আর এখন তার দ্বিগুণ সংখ্যক ভোটারের জন্য লক্ষমাত্রা দেওয়া হয়েছে মাত্র দুমাস। এর ফলে ভুলের পরিমাণ কতটা হবে তা সহজেই অনুমেয়। আট কোটি বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত, যা নির্বাচন কমিশন নিয়েছে, এত অল্পসময়ের মধ্যে তা যে কতটা অবাস্তব তা সকলেই বুঝতে পারছেন।

বিহারে বর্তমান ভোটার সংখ্যা ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ জন। এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিক মোটামুটি ২০ শতাংশ। ২০০৩ সালে ভোটার ছিল ৪.৯৬ কোটি। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে বহুজনের। যারা জীবিত আছেন তাদের সন্তানদের বৈধ ভোটার বলে গণ্য হবেন কিন্তু তাদের এনুমারেশন ফর্ম জমা দিতে হবে।তাতে তাদের যে ২০০৩ সালের তালিকায় নাম আছে তা বলতে হবে। ঐ তালিকা ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এর অর্থ উক্ত ভোটারদের উক্ত তালিকাটি দেখে তার রেফারেন্স ও তথ্যও জানাতে হবে। কমিশন যে বলছে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাভুক্তদের কোন কিছুই দিতে হবে না তা কি আদৌ ঠিক?

গত মাসের ২৫ জুন থেকে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তা আগে বিভিন্ন রাজ্যে ১৩ বার করা হয়েছে। বিহারেও তা হয় ২০০৩ সালে। কিন্তু যেভাবে ৯৮,৪৯৮ জন বিএলও নিয়োগ করে এবার প্রতিটি ভোটারের বাড়ী গিয়ে নাগরিকত্ব যাচাই করছে তা অভূতপূর্ব। এই প্রক্রিয়ার আইনি ভিত্তিটা সন্দেহজনক এই কারণে যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (১৯৫০) ২১(৩) ধারা অনুযায়ী কমিশন যেকোন সময়ে কোনও কেন্দ্র বা তার কোন অংশে কারণ দেখিয়ে 'বিশেষ সংশোধন' করতে পারে। কিন্তু নিবিড় সংশোধনের কথা আইনে উল্লেখ করা নেই। তাহলে আইন সংশোধন না করে কিভাবে এই প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? কমিশন যে বিদেশী অনুপ্রবেশকারীর যুক্তি খাড়া করতে চেয়েছে তার কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণও তারা দিতে পারেন নি। বিএলওরা একটা ছাপানো এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছে যা ২৫ জুলাই এর মধ্যে জমা দিতে হবে। যারা তা দিতে পারবেন না তাদের নাম ১ অগস্ট তারিখে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাবে। তারা অগস্ট মাসের মধ্যে নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্ধারিত ফর্ম ভরে নথিসহ আবেদন করতে পারবে। কমিশনের নির্দেশিত যে নথি জমা দিতে বলা হচ্ছে সেটাই বিতর্কিত। যারা ১ জুলাই ১৯৮৭ সাল থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মেছেন তাদের ক্ষেত্রে শুধু নিজের তো বটেই তাদের বাবা বা মায়ের মধ্যে যেকোন একজনের জন্মতারিখ ও এদেশে জন্মানোর প্রমাণ দিতে হবে। তার পরে জন্মালে বাবা ও মা উভয়েরই জন্মতারিখ ও স্থানের নথি যোগ করতে হবে। কমিশনের এই শর্তগুলি যে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অনুযায়ী প্রতিটি ভোটারের নাগরিকত্ব যাচাই করার চেষ্টা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কমিশনের ২৪ জুনের নির্দেশিকায় বিএলও দের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে কোন ভোটারকে দেখে যদি বিদেশী বলে সন্দেহ হয় তাহলে তারা যেন ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে তা রেফার করেন। এই আইনটি এখনও সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। একটি বিতর্কিত ও কার্যকর না হওয়া আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কিভাবে কোন রাজ্যের ভোটার তালিকাভুক্ত সমগ্র মানুষের নাগরিকত্ব যাচাই করতে পারে? একইসঙ্গে এই প্রশ্ন করাটাও অসঙ্গত নয় বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগে রাজনৈতিক দলগুলি, সামাজিক সংগঠন বা সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে বিনা আলোচনায় কী করে আচমকা এই প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হল? একটা বিশেষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এটা কি আদৌ প্রত্যাশা করা যায়? রাহুল গান্ধী যথার্থই বলেছেন , নির্বাচন কমিশন বিজেপি আরএসএসের এক শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাদের মত কথা বলছে। বিরোধী দলের বয়স্ক ও বরিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ করছে। চুনাও আয়োগের বদলে তারা গোদী আয়োগ হয়ে গেছে। তিনি এও অভিযোগ করেছেন বিহারে নির্বাচন চুরির জন্যই এই নতুন ষড়যন্ত্র। মহারাষ্ট্রে লোকসভা ও বিধানসভার মধ্যবর্তী সময়ে এক কোটি নতুন ভোটার যোগ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি এরা কারা বা কোথা থেকে এসেছিল?

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী যাদের নাম বাদ পড়ে যাবে তারা তো ২০২৪ সাল অর্থাৎ একবছর আগে লোকসভায় ভোট দিয়েছিলেন ও সরকারকে নির্বাচিত করেছিলেন। তাহলে কি বলব অবৈধ ভোটারদের ভোটে সাংসদেরা জিতে এসেছেন বা বর্তমান বিজেপি সরকার যে নির্বাচিত হয়েছে তা ঐ অবৈধ ভোটারদের দ্বারা ?

কমিশন যে ১১ টি নথির তালিকা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে আধার কার্ড,রেশন কার্ড এমনকি নির্বাচন কমিশনের নিজেদের তৈরী সচিত্র পরিচয়পত্র গ্রাহ্য হবে না। গ্রাহ্য হবে না ১০০ দিন কাজের জন্য দেওয়া পরিচয়পত্র। এখন প্রশ্ন যে সরকার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে সবথেকে নির্ভরযোগ্য নথি বলে মনে করে তা কি করে নির্বাচন কমিশন অগ্রাহ্য করে? আসলে পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকাংশ দলিত,জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন মনে করছে যে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিজেপি বিরোধী শিবিরের, ফলে এদের বাদ দিতে পারলেই বিজেপি সহজেই জয়ী হবে বিহারে।একইরকমভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় এই নিবিড় সংশোধন করতে চাইবে কমিশন যাতে বিজেপি সুবিধা পায়।

বিহারের জনসংখ্যার অধিকাংশই অত্যন্ত অল্প শিক্ষিত। মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট কার্ড আছে ১১/১২ শতাংশের কাছে। একটা বড় অংশ আজও নিরক্ষর। বেশীরভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানেন না।একটা বিরাট অংশ অন্যরাজ্যে কাজের জন্য যান। ফলে তাদের পক্ষে অতি অল্প সময়ে নথি জমা দেওয়া সম্ভব হবে না। মরসুমি পরিযায়ী শ্রমিকেরা শহরে বা ভিন রাজ্যে গেলে অন্তত ৩ থেকে ৬ মাসের জন্য যান। কখনও বা এক দুবছরও লেগে যায়। ফলে বিএলও রা তাদের বাড়ী গেলে তাদের পাবে না।ফলে তাদের নাম বাদ গেলেও তারা তা জানতে পারবেন না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী কেউ কিছুদিনের জন্য নিজের এলাকায় বসবাস না করলে যে তিনি সেখানকার বাসিন্দা নন তা বলা যাবে না। কিন্তু কমিশন এর বিপরীত ভাষ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষকে বিব্রত ও হেনস্থা করছে। আমাদের সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় কারা ভোটার হবে তা বলা আছে।আবার ৫ নং আর্টিকেলে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের কথাও উল্লেখ আছে। অসমে এনআরসি চালু করতে গিয়ে কয়েক লক্ষ বাংলাভাষী নাগরিককে ডি ভোটার করে একধরণের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। অসম সরকার এখন বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা থেকে পেছিয়ে আসতে চাইছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় স্তরে ৬৬ % ভোটদানের গড় ছিল। বিহারে ছিল ৫৬%। অর্থাৎ ১০ % কম। কমিশন কোথায় এই হার বাড়ানোর চেষ্টা করবে তা না করে কিভাবে তা কমানো যায় সেই চেষ্টা করছে যা গণতন্ত্রকে দুর্বল করার অপচেষ্টা।

স্বাভাবিকভাবেই এইসকল নির্দেশ ও দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেসসহ ১০ টি বিরোধী দল এবং একাধিক সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন আদালতের শরণাপন্ন হয়। অভিযোগ ছিল এর ফলে প্রায় তিন কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। যা মোট ভোটারের প্রায় ৩৭ শতাংশ। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তা গণতন্ত্রসম্মত বলে কিভাবে অভিহিত করা সম্ভব ? গত ১০ জুলাই বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। তাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে কমিশনের যুক্তিতে তারা সন্তুষ্ট নন। নাগরিকত্ব নির্ধারণ করার কাজ কমিশনের নয়,তা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক্তিয়ারে পড়ে। তছাড়া কমিশন যে ১১ টি নথি চাইছে তার কোনটাই নাগরিকত্বের স্পষ্ট প্রমাণ নয়, পরিচয়ের প্রমাণ। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে আধারের গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে। তারা এও বলেছেন জাতের শংসাপত্র পেতে আধার প্রয়োজন। সেখানে নথি হিসাবে জাতের শংসাপত্র গ্রাহ্য হয়েছে সেখানে আধারকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না ? যেসব নথি কমিশন চাইছে তা আমার কাছে চাইলে দিতে পারব না। তাদের বক্তব্য নাগরিত্ব যাচাই করার প্রয়োজন থাকলে তা অনেক আগে থেকেই করা উচিত ছিল। এত কম সময়ে এটা করা অনুচিত।

নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনটি প্রশ্নর জবাব চাওয়া হয়েছে। সেগুলি হলঃ

১) ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় কমিশনের ক্ষমতা।

২) উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া।

৩) নভেম্বরে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই প্রক্রিয়ার সময়সীমা যা অত্যন্ত কম।

বিচারপতিদ্বয় এটাও মনে করেছেন এই ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিহারের নির্বাচনকে না জড়িয়ে স্বাধীনভাবে সারা দেশে এই কাজ করা যেতে পারে।

আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন একজন যোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া গণতন্ত্রে আঘাত, সংবিধানের মূল কাঠামোয় আঘাত। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন কমিশন নোটিশের প্রেক্ষিতে বক্তব্য জানানোর জন্য লম্বা সময় চাইছে কারণ এর মধ্যে বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে তাতে আদালত আর হস্তক্ষেপ করবে না।সেইসাথে কমিশন তাদের একাজে রাজনৈতিক বৈধতা পেয়ে যাবে।তিনি প্রশ্ন তুলেছেন আইন পরিবর্তন না করে কিভাবে কমিশন কারও নাগরিকত্ব যাচাই করতে পারে ? আদালতের নির্দেশ আছে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মানার পর কারও নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারেনা।

এমাসের ২১ জুলাই এর মধ্য কমিশনকে লিখিত জবাব দিতে হবে। তারপর ২৮ জুলাই আবার এমামলার শুনানি হবে।আসলে বিজেপির আমলে সব স্বয়ং শাসিত সংস্থার মত নির্বাচন কমিশনও বিজেপি-আরএসএসের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের কমিটিতে প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নেওয়া হয়েছে যাতে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল তাদের ইচ্ছামত বশংবদ কমিশনের সদস্য ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন। বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রে যেভাবে নিয়োগ করেছিল বিজেপি সরকার তা নিশ্চই ভুলে যান নি।এই জ্ঞানেশ কুমার অমিত শাহের সমবায় দপ্তরের সচিব পদে ছিলেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি অযোধ্যায় রামমন্দির ট্রাস্ট গঠনের সময়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমন মানুষকে এহেন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেশের সব রাজ্যে যে বিজেপি ছলে বলে কৌশলে পেছনের দরজা দিয়ে গণতন্ত্রকে পদদলিত করে ক্ষমতায় বসতে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আর নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা? সোনার পাথরবাটির সমান।

বিদ্বেষের রাজনীতিতে পিতৃব্য হয়ে উঠতে চাইছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

মনিরুল হক

আর এস এস-এর পরিকল্পনায় পশ্চিম ভারতের গুজরাট থেকে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষের ঢেউ তুলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের যে খেলা শুরু হয়েছিল তা দক্ষিণ ভারতে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও উত্তর ভারতকে খানিকটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল। সেই বিদ্বেষের রাজনীতিতে বহু মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে, পারস্পরিক বিশ্বাস, ধর্ম সমন্বয় ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিজেপি অনেকগুলি রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিগত লোকসভার নির্বাচনে দলের কষ্টসাধ্য জয় বিজেপির নেতৃত্বকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। তাই এখন আর শুধু মুসলিম বিদ্বেষ নয়, তাদের অভিধানে বিদ্বেষের যত রকমের নমুনা আছে তা একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখছে। সুতরাং মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে চলছে কখনও খ্রিস্টান বিদ্বেষ, কখনও বা শিখ বিদ্বেষ। কখনও কেরালা রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষ, কখনও বা তামিলনাড়ুর প্রতি বিদ্বেষ। এছাড়াও আছে ভাষা বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ এবং আরও আরও কিছু। আর এই বিদ্বেষ রাজনীতিতে তাদের শ্রীক্ষেত্র হচ্ছে বাঙালি বিদ্বেষ ও বাংলা বিদ্বেষ।

এতো বৈচিত্র্যময় আমাদের দেশ, তাই নানা বিষয়ে নানান রকমের পার্থক্য থাকবেই। প্রেমের সঙ্গে যেমন বিরহ থাকে তেমনি ঐক্যের মধ্যে বিরোধও থাকে। সেই বিরোধ বা পার্থক্য অনেকেই কাজে লাগান। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির পার্থক্য হল এই যে, অন্যরা বিরোধ থেকে ফয়দা তোলার চেষ্টা করে আর বিজেপি বিরোধ নির্মাণ করে। বিজেপি এবং আর এস এস-এর দর্শন এবং ইতিহাস তাই বলে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা খুব দ্রুত সেই দর্শন ও ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছেন।

এটা বাস্তব যে অসমীয়া সংস্কৃতির প্রভাব আসামে সবচেয়ে প্রভাবশালী। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও ঠিক যে আসামের জনজীবনে বাঙালি সংস্কৃতিরও ব্যাপক প্রভাব আছে। তাই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতিই রাজ্যের মানুষের কাছে উপযোগী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। হিমন্তবাবু খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, আসামে বসবাসকারী যে সমস্ত মানুষ আদমশুমারিতে বাংলাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসাবে উল্লেখ করবেন তাঁদের বিদেশি বলে গণ্য করা হবে। আর এইভাবেই আসামে বসবাসকারী বিদেশীদের সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে। তবে যে কথাটি তখন বলে উঠতে পারেন নি তা হল, এইসব বিদেশিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠান হবে ! তাঁরা এর আগে এক ধাক্কায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে নিজেদের তৈরি করা কলমের খোঁচায় বে-নাগরিক বানিয়ে দিয়েছেন। সেই বে-নাগরিক মানুষদের একটা অংশ এখন ডিটেনশন ক্যাম্পের পথ ধরে অত্যন্ত করুণভাবে মৃত্যুপুরীর দিকে যাত্রা করছেন।

কিন্তু মাত্র ২০ লক্ষ জীবন নিয়ে খেলাধুলা করে আসামশর্মার মন ভরছে না। তিনি হতে চাইছেন দামোদর শেঠ। তাঁর দরকার আরও আরও মানুষ, আরও বেশি মানুষের নির্যাতন। তাই এখন আর শুধু মুসলিম খোঁজা নয়, কেউ বাংলায় কথা বললেই বা বাঙালি হলেই তাঁকে নির্যাতন করা জায়েজ বলে মনে করছেন শর্মাজী। তাইতো দেখি কোচবিহারের অধিবাসী আরতি ঘোষ এবং উত্তম ব্রজবাসীও আসামশর্মার থেকে NRC-র নিমন্ত্রণ পত্র পাচ্ছেন ! এখন আসামের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটির কিছু বেশি। তার মধ্যে বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। আর মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি। এঁরা সবাই তাঁর নির্যাতনের লক্ষ্য।

কেউ ভাবতে পারেন, ৩ কোটি জনসংখ্যার রাজ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করে কি কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারে? পারে কি না পারে সেটা বড় কথা নয়। কথাটা হল এইরকম নির্যাতনের অস্ত্র হাতে রেখেই শর্মাজী ২০২৬ এর নির্বাচনে উৎরে যেতে চাইছেন। ‘আ মরি হিন্দুত্ব’ -এর প্রতি গদগদ হয়ে অথবা ভয়ের চোটে গত লোকসভা নির্বাচনে বাঙালি হিন্দুদের একটা বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। অসমীয়াদের ভোটের একটা অংশও বিজেপি পেয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৩৭.৯ শতাংশ। অপরদিকে বিধ্বস্ত প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকেও ভোট দিয়েছিলেন ৩৭.৯ শতাংশ মানুষ। কংগ্রেসের পাওয়া ভোটের বড় অংশ অসমীয়াদের ভোট। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হিমন্তবাবু আরও বেশি ভোট চান। অনুগত বাঙালি হিন্দুদের ভোট তো আর বাড়বে না। তিনি চান অসমীয়ারা তাঁকে আরও বেশি বেশি ভোট দিন। তাই নতুন করে বাঙালি নির্যাতনের পথই তিনি বেছে নিয়েছেন। তিনি ভাবছেন, এতে একদিকে অসমীয়াদের কাছে তিনি অসমপুরুষের মর্যাদা পাবেন আর অপরদিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যাওয়ার ভয়ে বাঙালি হিন্দুরাও তাঁর প্রতি ভৃত্যসম আনুগত্য দেখাবেন। কিন্তু হিমন্তবাবুর প্রতি বাঙালি হিন্দুদের এই আনুগত্য বজায় থাকবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা

দিয়েছে। বাংলা ভাষা হল বরাক উপত্যকার সরকারী ভাষা। এই ভাষাতেই সেখানে সরকারী কাজকর্ম চলে। বাকি অসমের ক্ষেত্রে বাংলা হল সরকার নির্দেশিত দ্বিতীয় ভাষা। বরাক উপত্যকার কাছাড়, হোজাই, হাইলাকান্দি,করিমগঞ্জ বাঙালি অধ্যুষিত জেলা। এখানকার বাসিন্দাদের ৮০ ু বাঙালি। ১৯৬১ সালে দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ফলেই বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। উপত্যকার মানুষ ফুঁসছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হুমকিতে তাঁরা ভীত নন। আগামী আদমশুমারিতে তাঁরা নিজেদের ভাষা বাংলা বলেই ঘোষণা করবেন। প্রয়োজনে ভাষার জন্য তাঁরা আবার লড়াই করবেন। এ ছাড়াও গোয়ালপাড়া ও ধুবড়িতে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। স্বাভাবিক ভাবেই আসামের সর্বস্তরের বাঙালিরা হিমন্তবাবুর বাঙালি বিরোধী এই কথাবার্তার ব্যাপক প্রতিবাদ করছেন। কেউ কেউ মনে করছেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোযোগ যাতে তাঁর প্রতি আরও বেশি মাত্রায় থাকে তার জন্যই শর্মাজী বাংলাভাষী তথা বাঙালিদের প্রতি এমন আচরণ করছেন। কিন্তু আসল কথা হল, হিমন্ত বিশ্বশর্মার এই বাঙলা ও বাঙালি বিরোধী জেহাদ বিজেপির নীতি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অতিমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিদ্বেষ বাদ দিয়ে বিজেপির রাজনীতি হয় না, হতে পারে না।

ভূস্বর্গ সন্দর্শনের স্বপ্ন সার্থক

মজিবুর রহমান

কাশ্মীর সফরের ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। ঐতিহাসিক অথবা ভৌগলিক গুরুত্ব সম্পন্ন দেশবিদেশের বেশকিছু স্থানে ভ্রমণে গেলেও কাশ্মীর যাওয়া হয়নি। এবছর (২০২৫) মার্চের প্রথম সপ্তাহে পারিবারিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়- এবারের গন্তব্যস্থল কাশ্মীর। পরিবার বলতে ‘হাম দো হামারা দো’- আমি মজিবুর রহমান (৫০), আমার সহধর্মিনী নাফিসা আলম (৪৬), ছেলে অকৈতব আবেদিন বৈভব (২১) ও মেয়ে সুহানা রেহমান (১৩)। বৈভব ল’ নিয়ে পড়ে, কলকাতায় থাকে। ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা বলা সহ প্রায় পুরো বিষয়টি বৈভবই দেখে। ২১শে মার্চ এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়। সূচি স্থির হয়- ২৪.৬.২০২৫ কলকাতা-দিল্লি-শ্রীনগর এবং ১.৭.২০২৫ শ্রীনগর-দিল্লি-কলকাতা। ২২শে এপ্রিল ঘটে যায় পহেলগামের ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই ট্যুর বাতিলের কথা ওঠে। আমি তাড়াহুড়ো না করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখি এবং মনে মনে ঠিক করি ট্যুর এজেন্সি ট্রিপ বাতিল না করলে অবশ্যই যাবো। ১২ই জুন আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। আবারও সফরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচি অপরিবর্তিতই থাকে।

সাত রাত ও আট দিনের সফরে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যথাসম্ভব উপভোগ করেছি। কাশ্মীরের মাটি ও মানুষ তথা সংস্কৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের পাঠ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া ধারণার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল-অমিল সন্ধান করেছি। তবে এটা ঠিক যে, মাত্র এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা বৃহৎ জনপদ ও পুরনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গভীর সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। সেটা অবশ্য একজন সাধারণ পর্যটকের কাজও নয়।

কাশ্মীরের বিভিন্ন দিকে প্রচুর দর্শনীয় স্থান (Sightseeing) রয়েছে। সবগুলোই ভালোভাবে দেখতে অন্তত এক মাস সময় দরকার। সময়ের স্বল্পতার কারণে ট্যুর এজেন্সির প্যাকেজে কোনো একটি স্থানের সকল দৃশ্য, মুহূর্ত বা স্পট অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কোনো কোনো পয়েন্ট প্রশাসনিক অথবা আবহাওয়ার কারণে কখনও কখনও বন্ধ রাখাও হয়।

আমাদের ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে রাহেজা ভ্যাকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। হোটেল, প্রাতরাশ ও নৈশাহার সহ গাড়িতে ঘোরানোর চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী শ্রীনগরে হোটেল সিটি গ্রেস-এ ২৪-২৮ জুন পাঁচ রাত, পাহালগামে হোটেল ভ্যালি রিসর্ট-এ ২৯শে জুন এক রাত এবং শ্রীনগরে হাউসবোট সুলতান-এ ৩০শে জুন এক রাত থাকি। ২৪শে জুন শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে শহরে প্রবেশ এবং পয়লা জুলাই প্রস্থানপূর্বক সেখানে পৌঁছনো সহ মাঝের দিনগুলোতে ঘোরাঘুরি করি একটি টয়োটা গাড়িতে। গাড়িচালক ছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের মোহাম্মদ ইকবাল মীর। এই ক’দিনের আলাপে ইকবালকে একজন সময়জ্ঞান ও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে। উনি কার্যত আমাদের গাইডের ভূমিকাও পালন করেন।

ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীনগর জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। এখানকার হ্রদ, পাহাড়, সবুজ মাঠ, বার্চ ও উইলো গাছে পূর্ণ অরণ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই উইলো গাছের কাঠ থেকে ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি হয়। শ্রীনগর কার্পেট, রেশম, পশম, কাঠ ও চামড়াজাত কুটিরশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

লালচক কলকাতার ধর্মতলার মতো শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এটি রাজনৈতিক সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সেরা ঠিকানা। একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকাও বটে। প্রচুর পায়রার সমাগম লালচকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ১৯৮০ সালে নির্মিত এখানকার সুদৃশ্য ক্লক টাওয়ার (ঘণ্টা ঘর) শ্রীনগর শহরের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টাওয়ারের মাথায় পৎপৎ করে উড়ছে ভারতীয় জাতীয় পতাকা।

১৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ডাল লেক শ্রীনগরের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। জলাশয়ের ওপর হাউসবোটে রাত্রি কাটানো একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। বিশেষ ধরনের নৌকা শিকারায় চড়ে হ্রদটা ঘুরে দেখাটাও খুব মজাদার। ভাসমান মীনা বাজারে কাশ্মীরি শাল, কাঠের কাজ, শুকনো ফল আরও অনেককিছু।

ডাল লেকের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ১৬৩৩ সালে সৃষ্ট নিশাত বাগ মুঘল গার্ডেন। উর্দুতে নিশাত শব্দের অর্থ আনন্দ। অপর নাম আনন্দ উদ্যান। এই মনোরম উদ্যানে সময় কাটালে মন ভালো হওয়ারই কথা। ডাল লেকের সঙ্গে একটি প্রণালীর মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে শালিমার বাগ। শালিমার একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ 'সুন্দর বাগান' বা 'স্বর্গীয় স্থান'। ১৬১৯ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী নূর জাহানের জন্য এই উদ্যানটি নির্মাণ করেন। ৩১ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই মুঘল গার্ডেনে জলের ফোয়ারা ও চিনার গাছের আধিক্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডাল লেকের উত্তর তীরে রয়েছে হযরতবাল মাজার বা দরগাহ শরীফ। সম্রাট শাহজাহানের সময় সুবেদার সাদিক খান ১৬৩৪ সালে এটি নির্মাণ করেন। এখানে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাতের লেখা কুরআনের একটি কপি সংরক্ষিত রয়েছে।

ডাল লেকের পশ্চিমে শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে শ্রীনগরের ভূমিপৃষ্ঠ থেকে ১১০০ ফুট উচ্চতায় শারিকা পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছে হরি পর্বত দুর্গ। দুর্গের প্রাচীরটি মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) কর্তৃক ১৫৯৭ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে আফগান দুররানি শাসনামলে কাশ্মীরের গভর্নর আতা মোহাম্মদ খান ১৭৯৫-১৮০৬ সালে দুর্গটি নির্মাণ করেন। ১৫০টি সিঁড়ি বেয়ে দুর্গের মাথায় পৌঁছানো যায়। আরোহণে কষ্ট হলেও অবতরণে আরাম। দুর্গে মন্দির, মসজিদ ও গুরুদ্বারা রয়েছে। দুর্গ থেকে ডাল লেক এবং আশপাশের অন্যান্য এলাকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এখন এই দুর্গে বিএসএফ-এর ক্যাম্প রয়েছে। দুর্গের মাথায় উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা।

শ্রীনগরের পার্শ্ববর্তী গান্ডারবাল জেলার মানসবল হ্রদের প্রান্ত সারা বছর পদ্ম গাছে পূর্ণ থাকে। চারটি গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত এই দৃষ্টিনন্দন হ্রদটির জল মিষ্টি। হ্রদের পাশে একটা পার্ক রয়েছে। হ্রদের চারপাশে হাঁটার জন্য ওয়াকওয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানে শিকারা রাইডের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রচুর জলজ পাখি হ্রদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

মানসবলের অদূরেই রয়েছে ভারতের বৃহত্তম স্বাদু পানির হ্রদ উলার হ্রদ। এখানেও প্রচুর পরিমাণে পাখি বাস করে। অনেক পরিবার এই হ্রদের জলজ উদ্ভিদ থেকে মানুষের খাবার ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করে। কাশ্মীরের মোট মাছের অর্ধেকের বেশি এই হ্রদ থেকে সংগৃহীত হয়। ১৯৯০ সালে এটিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

শ্রীনগর থেকে ৮১ কিলোমিটার দূরে সিন্ধু নদীর তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সোনমার্গ বা স্বর্ণময় তৃণভূমি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হলেও স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এলাকাটি অনুপযোগী। এই মনোরম শহরের পটভূমিতে রয়েছে তুষারময় পাহাড়ের পেছনে সুনীল আকাশ। সিন্ধু নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ বারিধারা সোনমার্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। দুই লেন বিশিষ্ট সাড়ে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ সুদৃশ্য সোনমার্গ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে সময় লাগে পনের মিনিট। ১৩.১.২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সুড়ঙ্গটি উদ্বোধন করেন। সোনমার্গ থেকে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় বিখ্যাত থাজিয়াস হিমবাহে। এখানকার মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশে একাধিক হিন্দি ছায়াছবির শ্যুটিং হয়েছে। আমাদের চারজনের ক্ষেত্রেই সোনমার্গে জীবনে প্রথমবারের মতো হর্স রাইডের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

সোনমার্গ থেকে দশ কিলোমিটার দূরে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থান করছে কাশ্মীর উপত্যকার অন্তিম জনবসতি সরবাল। সরবালবাসীদের জীবিকা মূলত কৃষিনির্ভর। গ্রামবাসীরা শীতকালে ভারী তুষারপাতের কারণে ফি বছর বাড়িঘর ছেড়ে আশেপাশের এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

হিমালয় পর্বতমালার অন্যতম উচ্চতম গিরিপথ জোজিলা পাস কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। শ্রীনগর থেকে ১০৮ কিলোমিটার দূরবর্তী জোজিলা পাস জিরো পয়েন্টের উচ্চতা ১১৬৪৯ ফুট। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে জোজিলা ওয়ার মেমোরিয়াল। এখানে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা ও সিন্ধু নদীর জলধারার সংমিশ্রণে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীনগর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৬৯০ ফুট উচ্চতায় পীর পাঞ্জাল পর্বতমালায় এবং বারামুল্লা জেলায় অবস্থিত গুলমার্গের সামগ্রিক সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। গুলমার্গ শব্দের অর্থ ফুলের বাগান। গুলমার্গের ফুলেল শুভেচ্ছায় পর্যটক বিমোহিত হতে বাধ্য। প্রাকৃতিক কারণে বসবাসের উপযোগী না হলেও গল্ফিং, ট্রেকিং, স্কিইং ও হর্স রাইডের দুর্দান্ত সুযোগ সহ নানাবিধ উপকরণ নিয়ে পর্যটকদের মনোরঞ্জন করতে গুলমার্গের জুড়ি নেই।

গুলমার্গ গল্ফ ক্লাব বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম গল্ফ কোর্স। ৭৫০৫ গজ বিশিষ্ট এই গল্ফ কোর্সে ১৮টি গর্ত রয়েছে। গুলমার্গ গন্ডোলা কেবল রাইড এশিয়ার দীর্ঘতম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম। এমন উচ্চতা থেকে আশেপাশের ও নিচের দৃশ্যাবলী দেখতে দারুণ লাগে। ফেজ ১ কেবল রাইড দশ মিনিটে গুলমার্গ থেকে ৩০৫০ মিটার উচ্চতায় কংডোরি পৌঁছে দেয়। ফেজ ২ কংডোরি থেকে ৪৩৯০ মিটার উচ্চতায় আফারওয়াত শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত। আফারওয়াত শৃঙ্গের পাদদেশে রয়েছে আলপাথার হ্রদ। বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে বলে হিমায়িত হ্রদ বলে।

গুলমার্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হল মহারাজা প্যালেস। ৮৭০০ বর্গফুটের এই চমৎকার স্মৃতিসৌধটি কাশ্মীরের রাজকীয় অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। গুলমার্গ সেনা জাদুঘর ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদর্শন করে। পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন সামরিক সংঘাতের তথ্য তুলে ধরে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অত্যাধুনিক জাদুঘরে শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন সহ কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নমুনা দর্শন পর্যটকদের জন্য একটি বাড়তি প্রাপ্তি।

শ্রীনগর থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে অনন্তবাগ জেলায় লিডার নদীর তীরে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র পাহালগামে একাধিক দৃষ্টিনন্দন পার্ক, উদ্যান ও হিমবাহ রয়েছে। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে ও গাড়িতে চেপে সেসব ঘুরে দেখা যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে অমরনাথ মন্দিরের বার্ষিক তীর্থযাত্রার সূচনা এখান থেকেই হয়ে থাকে। এখানকার বাইসারন উপত্যকা অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে ‘ভারতের মিনি সুইজারল্যান্ড’ নামে পরিচিত। ২২শে এপ্রিলের ঘটনার পর থেকে বাইসারন সহ পাহালগামের একাধিক ট্যুরিস্ট স্পট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। এজন্য ঘোড়ায় চড়ে তিন-চারটি পয়েন্ট দেখেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে

কাশ্মীরের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আপেল, আখরোট, নাশপাতি, চেরি ও বেরি ফলের বাগান। এসব ফলের বাগান যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি পাহালগামের কাছাকাছি সঙ্গম বলে একটি জায়গায় ক্রিকেট ব্যাট তৈরির কারখানা।

কাশ্মীরের মনোমুগ্ধকর ভূপ্রকৃতির মতো কাশ্মীরিদের মানসিক গঠনের মধ্যেও একটা মিষ্টতা রয়েছে। কাশ্মীরি নর ও নারীরা সাধারণত টিকালো নাক ও ফর্সা রংয়ের সমন্বয়ে সুদর্শন ও সুদেহী হন। তাঁদের চেহারার মতো আচরণও সুন্দর। মাথা গরম করে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন না। তরুণ-তরুণী সহ পরিণত বয়সের মানুষজন সকলেই কাশ্মীরের ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরতে পছন্দ করেন। নিজেদের মধ্যে কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলেন। কাশ্মীরের মানুষ যথেষ্ট অতিথিবৎসল হন। পর্যটকদের সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করেন না। মিথ্যাচার অথবা প্রতারণামূলক আচরণ পরিহার করেন। পুরুষরা সিগারেট ও হুঁকা খান কিন্তু কেউই মদ্যপান করেন না। তাই কোথাও মাতলামি করার দৃশ্য দেখা যায় না। জীবন যাপনে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। কাশ্মীরে নৈশক্লাব বলে কিছু নেই। কাশ্মীরের মানুষ বিশ্বাস করেন- দিনে কাম রাতে আরাম। তাই সন্ধ্যা রাতেই বিভিন্ন পণ্যের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কাশ্মীরে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বাইরে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সংঘাতে কোনো খুনোখুনির ঘটনা ঘটে না। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ এককথায় নারী নির্যাতন নেই। চুরি ডাকাতি ছিনতাইয়ের কেস কম। বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও বিরল।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে নবগঠিত পাকিস্তান ও ভারতের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের কিছু হানাদার কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। রাজা হরি সিং তাদের বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরকম একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। ভারত-পাক যুদ্ধ শেষে কাশ্মীরের একটা অংশ পাকিস্তানের দখলে চলে যায়। বাকিটুকু থাকে ভারতে। কাশ্মীরিদের অখণ্ড স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে যায়। সেই স্বপ্নভঙ্গের ক্ষত বিগত আট দশকেও শুকোয়নি। ভারত নয় পাকিস্তান নয় কাশ্মীরিদের চেতনায় আজও সক্রিয় আজাদ কাশ্মীরের আকাঙ্ক্ষা।

কাশ্মীরের জঙ্গিবাদ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যত প্রচার করা হয় বাস্তব পরিস্থিতি ততটা ভয়ংকর নয় বলেই কাশ্মীরিদের বিশ্বাস। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কিত প্রচারের বাড়াবাড়িতে উপত্যকার বাইরে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হওয়ার জন্য কাশ্মীরের মানুষ সংবাদমাধ্যমের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। মিলিট্যান্সিকে দমন করার নামে কাশ্মীরে যে পরিমাণ মিলিটারি মোতায়েন করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়েও কাশ্মীরিদের মনে প্রশ্ন আছে। সাম্প্রতিক পহেলগাঁওকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান তৈরি করা হয়েছে তার সঙ্গে স্থানীয় মানুষ সহমত পোষণ করেন না।

কাশ্মীরের মানুষ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। অবশিষ্ট ভারতবাসী কাশ্মীরিদের যে দৃষ্টিতে দেখেন তাতে তাঁরা বিচলিত ও অসম্মানিতবোধ করেন। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাশ্মীরিরা উপত্যকার বাইরে যেতে চান না। জম্মু-কাশ্মীরের এক অংশের মানুষ অন্য অংশ ঘুরে দেখেন। আমরা এই ক'দিন বিদেশী বা বহিরাগত পর্যটকের চেয়ে স্থানীয় পর্যটকই বেশি দেখলাম। গোটা কাশ্মীর জুড়ে স্থানীয় পুলিশ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী- বি এস এফ, সি আর পি এফ। শ্রীনগর শহরে কয়েক হাত অন্তর অন্তর সেনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা যত কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি দেখেছি তত পাবলিক বাস দেখিনি। সি আর পি এফ-এর কনভয় পাস করার জন্যেও অন্যান্য গাড়িকে আটকে রাখা হয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রাজনৈতিক বিতর্ক- এই দুই দিক থেকে কাশ্মীর অনন্য হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অকাশ্মীরিদের আকৃষ্ট করে কিন্তু কাশ্মীর কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অস্থিরতা পর্যটকদের সেখানে যেতে নিরুৎসাহিত করে। কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থান কাশ্মীরিদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-পাক শত্রুতামূলক সম্পর্কের শিকার হচ্ছে কাশ্মীর।

আমরা বাঙালিরা অসহ্য গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে একটু পাহাড়ে ঘুরতে যাই। এবার কিন্তু আমাদের সেটা হল না। কাশ্মীরে কোথাও শীতের সন্ধান পেলাম না। আমাদের সমস্ত শীতবস্ত্র ব্যাগবন্দিই রয়ে গেল। গাড়িতে-হোটেলে ফ্যান-এসি ব্যবহার করতে হল। আসলে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত এখানেও অনেক রোদ পড়ে এবং গরম লাগে। তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকায় ভ্যাপসা ভাবটা থাকে না। এই কটা দিন কাশ্মীরের মানুষ শীতবস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রাখতে পারে। অন্যদিকে, অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ছ'মাস কাশ্মীর তুষারাবৃত থাকে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য বহিরাগত পর্যটকদের মানসিক প্রশান্তি দিলেও শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না। এক সপ্তাহের সফরেই আমাদের শরীরে ট্যান পড়েছে।

কাশ্মীরের অনেক জায়গাতেই ফলকের ওপর লেখা থাকে ওয়েলকাম টু প্যারাডাইস অন আর্থ। সবুজ উপত্যকা, তুষারাবৃত পর্বত, সুন্দর হ্রদ, হিমবাহ, জলপ্রপাত, বিস্তীর্ণ বাগান, তৃণভূমি, বিশাল বৃক্ষ কাশ্মীরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে যে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে তাতে পরকালের কল্পিত স্বর্গ যেন ইহকালেই বাস্তব হয়ে উঠেছে।

ফার্সি ভাষার কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫) লিখেছিলেন, ‘অগর ফিরদৌস বর রুয়ে জমিন অস্ত/হমিন অস্ত...হমিন অস্ত...হমিন অস্ত!’ এর অর্থ হল ‘পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, তা সে/এখানেই... এখানেই... এখানেই!’ হ্যাঁ, এই শায়েরী কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কথাকার প্রফুল্ল রায়

(১৯৩৪ - ২০২৫)

উৎপল ঝা।

যাঁর কাছে ‘ ল্যান্ড, পিপল এবং টাইম ‘ অত্যন্ত মূল্যবান, সেই কথাকার প্রফুল্ল রায়ের জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর ,১৯৩৪ অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়ায়। বাল্য ও কৈশোর কেটেছে সেখানেই ।দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে ভিটে- মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে এই বঙ্গে আসা। সহায় -সম্বলহীন অবস্থায় কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে বিহারের প্রত্যন্ত এক শহরে আশ্রয় নেওয়া। অবশেষে আবার কলকাতায় ফিরে আসা এবং ছোট- খাটো কিছু কাজ করে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন ।তারপর যুগান্তর পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সাময়িকী - র সম্পাদকের দায়িত্বে বৃত হন ।পরবর্তীকালে ‘ প্রতিদিন’ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের প্রথম সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন (১৯৯২ সাল থেকে)। দুটি পত্রিকা মিলে মাত্র ২২ বছরের চাকুরী জীবন আর বাকি পাঁচ দশকের নির্ভেজাল লেখালিখি ।তাই নিজেকে ‘ আংশিক সময়ের চাকুরিজীবী ‘ বলতেই পছন্দ করতেন ।

লেখার জগতে তাঁর আবির্ভাব একটি তর্কাতর্কি বা চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে ।তখন তিনি কলকাতায় , তার আগে দেখে এসেছেন বিহারের অসহনীয় দারিদ্র্য, শোষণ , জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার নিদারুণ ছবি ।ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখের সামনে ।সেখানে দেখেছেন বেগারি প্রথা , ভূমিদাসদের ওপর সীমাহীন জমিদারি অত্যাচার ।কলকাতায় চলে আসার পরও মাঝে মাঝে বিহারের রাঁচি , ছোটনাগপুর, পাটনায় বার বার ছুটে গেছেন সেইসব এলাকার মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য । কলকাতায় একদিন তিনি একজন নামী লেখকের গল্প নিয়ে কিছু সমালোচনা করলে সেই লেখক তাঁকে বলে ওঠেন-- ‘ নিজে একটা গল্প লিখে দেখাও , তবে বুঝব।’ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রফুল্ল রায় লিখে ফেলেন , ‘মাঝি ‘ নামে একটি গল্প , যা ‘দেশ ‘ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; জন্ম হয় এক শক্তিশালী কথাকার - এর।

এইসময়ে হঠাৎ তাঁর একটা সুযোগ ঘটে যায় ভারতের পূর্বোত্তর প্রান্ত নাগাল্যান্ড - এ যাওয়ার ।দুর্গম , দুর্ভেদ্য অরণ্যবেষ্টিত সেই জনপদ আর সেখানকার নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত নাগা জনজাতি তখন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করছে। তিনি সেখানে গিয়ে এই নাগা জন- জাতির জীবনচর্যা, আচার - আচরণ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করেন । এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখে ফেলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘পূর্বপর্বতী ‘ , যা মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত ‘ অমৃত ‘ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১৯৬৮ -৬৯)।

তাঁর মনে হয়, এই বিশাল ভারতবর্ষ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে হলে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে হবে ।সেই উদ্দেশ্যে তিনি উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে জাহাজ আন্দামানে চলেছে তাতে উঠে পড়েন। আন্দামানে একদিকে যেমন ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনকালে দ্বীপান্তরিত কয়েদিদের ও তাঁদের বংশধরদের সঙ্গে পরিচয় হয় তেমনি সেলুলার জেলে বন্দি বিপ্লবীদের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের বিবরণ সম্পর্কেও অবহিত হন। সেই জীবনের কথা অবলম্বনে রচিত হয় তাঁর উপন্যাস ‘ সিন্ধুপারের পাখি’ (১৯৫৮), আর আন্দামানের উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত হয়, ‘নোনা জল মিঠে মাটি ‘ উপন্যাস (১৯৫৯)।

দেশভাগের বেদনা তাঁকে সারা জীবন তাড়িত করেছে ।কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সেই দেশভাগের যন্ত্রণা তেমন ভাবে উঠে আসেনি দেখে তিনি নিজেই এই বিষয়ে বিশাল পটভূমিতে লিখে ফেলেন তিন খণ্ডে তিনটি উপন্যাস - ‘কেয়া পাতার নৌকো,’ ‘শতধারায় বয়ে যায়’ এবং ‘উত্তাল সময়ের ইতিকথা’ নামে মহাকাব্যিক উপন্যাস ।

আন্দামান থেকে ফিরে এসে চলে যান দণ্ডকারণ্যে, যেখানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ চলছে ।শুধু সেখানেই নয় ছুটে গেছেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে, কোংকণ উপত্যকায় ।এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার প্রয়াস খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা গেছে।

এইসব অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর দেড়শ’র মতো উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আকাশের নীচে মানুষ, মহাযুদ্ধের ঘোড়া, সসাগরা, ভাতের গন্ধ , রামচরিত্র , ক্রান্তিকাল প্রভৃতি।

তাঁর লেখা উপন্যাস ও গল্পের ভিত্তিতে প্রায় চল্লিশটির মতো চলচ্চিত্র ও টেলিফিল্ম রচিত হয়েছে , তার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয় ।তাঁর কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য - এখানে পিঞ্জর (১৯৭১), বাঘবন্দী খেলা (১৯৭৫), আদমি আউর ঔরত (১৯৮৪ , পরিচালনা তপন সিংহ), চরাচর (পরিচালনা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত), মন্দমেয়ের উপাখ্যান (২০০৩) প্রভৃতি ।

তিনি নিজে তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য সাহিত্য অকাদেমি, বঙ্কিমস্মৃতি, শরৎস্মৃতি এবং রামকুমার ভুয়ালকা পুরস্কার সম্মানিত হয়েছেন।

গত ১৯ জুন , ৯১ বছর বয়সে এই বরণীয় সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটেছে । প্রচার বিমুখ, আড়ালে থাকা , কোমল হৃদয়ের, স্নেহপ্রবণ এই কৃতী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের ভুবনে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা।

কৃষি অর্থনীতিবিদ নৃপেন বন্দোপাধ্যায় প্রয়াত

আব্দুল অলিল

বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং দৈনিক কালান্তর পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর প্রাক্তন সভাপতি নৃপেন বন্দোপাধ্যায় গত ৫ ই জুলাই কলকাতায় নিজস্ব বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। রেখে গিয়েছেন একমাত্র কন্যা নাতি নাতনী সহ পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের । তাঁর স্ত্রী মহিলা আন্দোলনের নেত্রী বেলা বন্দোপাধ্যায় অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন ।ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা রমেন ব্যানার্জি এবং প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক প্রীতি ব্যানার্জি ছিলেন তাঁর দাদা বৌদি। নাট্য নির্দেশক অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভাই নৃপেন বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দোপাধ্যায় এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু , কালান্তর সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়,চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ প্রমুখ।

নৃপেন বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৯ সালের ৩ নভেম্বর কলকাতায়। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে । ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পার্টি কংগ্রেস বা মহাসম্মেলনে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি এবং প্রথম পাটি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত , কিন্তু এদিন তিনিও চলে গেলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনোমিক্সে এম এ পাশ করে তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগরো ইকোনোমিক্স রিসার্চ বা কৃষি অর্থনীতির গবেষক হিসেবে যুক্ত হন। পরবর্তী কালে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং গবেষক বরুন দের আহ্বানে যদুনাথ সরকার সমাজ বিদ্যা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। নৃপেন বন্দোপাধ্যায় বামফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্যের ফাইন্যান্স কমিটির দীর্ঘদিন সদস্য ছিলেন। কৃষি অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে খ্যাত এই মানুষটি ছিলেন কালান্তরের নিয়মিত লেখক, দেশের এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে বাজেট পেশ হলে তা সহজ সরল বাংলা ভাষায় বাজেটে মানুষের সুবিধা, অসুবিধার নানা দিক গুলো কালান্তরের পাতায় বিশ্লেষণ করে লিখতেন। তিনি দীর্ঘদিন কালান্তর পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সেখানে তাঁর আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে নৃপেন বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার সমাজ বিদ্যা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায়,যোশী অধিকারী ইনস্টিটিউটের অরিন্দম দত্ত, কালান্তর সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিআই নেতা প্রবীর দেব, সিপিআই(এম) নেতা কৌস্তুভ চ্যাটার্জি প্রমুখ। নৃপেন বন্দোপাধ্যায়ের নিথর দেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ঢোকানোর মূহুর্তে সমবেত কণ্ঠে ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূণ্যকরো দহন- দানে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, আইনজ্ঞ এবং মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

(৫ নভেম্বর, ১৮৭০ -- ১৬ জুন, ১৯২৫)

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩

১৯২১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য দেশবন্ধু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালে কারাগারে থাকার কারণে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। পরের বছর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি ১৯২২ সালে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন। এরপর তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯১৯-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন তিনি।

১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেন। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের আহ্বান সমগ্র বাঙ্গালীকেই প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখ্য প্রতিনিধি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের লক্ষ্যে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ নামে

ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ চুক্তিতে মুসলমান মধ্যবিত্তের অনগ্রসরতা দূর করার বিশদ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্ভবত এ চুক্তির কারণেই ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আইন সভা নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত রাজনৈতিক দল স্বরাজ্য দল বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। আর বিজয়ী আইনসভা সদস্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্বরাজ্য দল তখন একটি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য লাভ করে। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র।

১৯২৪ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দমানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার '১ নং বেঙ্গল অর্ডিনান্স ' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল-রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা। ওই সময় কলকাতা থেকে সুভাষ চন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহনসহ প্রথম সারির নেতাদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশ সরকার। তখন চিত্তরঞ্জন দাশ নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আহ্বান করেন। গান্ধিজি উপলব্ধি করেন স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যেই এই অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়েছে। এরপর থেকে গান্ধীজী দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে পরপর দুবার মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি চাকরির ক্ষেত্রে অবহেলিত মুসলমানদের অধিক হারে সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করেন।

রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। 'মালঞ্চ', 'সাগর সঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

জন্ম ও শিক্ষা

চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর, কলকাতায়। তাঁর বাবা ভুবনমোহন দাশ। মা নিস্তারিণী দেবী। চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষিত পরিবার হিসেবে তাঁদের পরিবারের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নী ছিলেন। তিনি উচ্চ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি শ্লোক ও স্তোত্র গীত রচনা করতেন, যা প্রতিদিন সকালে গাইতেন। 'ব্রাহ্ম জনমত'-এর সম্পাদক হওয়ায় কলকাতার সাংবাদিকতা জগতে বেশ পরিচিত ছিলেন তিনি। রাজনীতি সচেতন ও দাতা স্বভাবের এই মানুষটি সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ছোটবেলা থেকেই বাবার গুণগুলো নিজের জীবনে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মা নিস্তারিণী দেবী উচ্চ শিক্ষিত না হলেও, তিনি ছিলেন উচ্চমনের অধিকারী। তিনি সহজ-সরল, অতিথিপরায়ন ও নীতিবান ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা দাতা স্বভাবের হওয়ার কারণে তাঁদের পরিবারে একসময় অভাব-অনটন দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর মা পরিবারের এই অভাব সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেন। কোনো প্রতিকূল পরিবেশ এলে তিনি ঘাবড়ে যেতেন না। চিত্তরঞ্জন দাশরা আট ভাই-বোন ছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

চিত্তরঞ্জন দাশের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ হওয়ার পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে তাঁর বাবার সাথে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসেন। কারণ তখন তাঁর বাবা কলকাতার ভবানীপুরে বসবাস শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭৯ সালে ভবানীপুর লন্ডন মিশানারি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ্যবই পড়ার চেয়ে পাঠ্যতালিকার বাইরের বই পড়তে বেশী পছন্দ করতেন তিনি। যে কারণে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল খুব ভাল হতো না।

চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে বিপিন চন্দ্র পালের সংস্পর্শ আসেন। বিপিন চন্দ্র পাল সেই সময়ের একজন নামকরা রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে চিত্তরঞ্জন দাশ দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৮৬ সালে লন্ডন মিশানারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। কলেজ জীবনে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য হন। একপর্যায়ে তিনি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে যান। বিলেতে থাকার সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন এবং আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়। পেশা জীবনের শুরুতে তাঁর সামান্য আয় হত। যা দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন।

এসময় তাঁর বাবাও ঋণে ডুবে যান। এই কঠিন দুরাবস্থার সময় তাঁর বাবা কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু তিনি নির্বাচনে জিততে পারেননি। পরোপকার ও উদারতার কারণে তাঁর এই ঋণ বাড়তেই থাকে। এসময় তাঁর অফিসের এক ক্লার্কের অনুরোধে এক ব্যক্তির জামিন হন তিনি। কিন্তু ওই ব্যক্তিটি আত্মগোপন করার কারণে ভুবনমোহনের কাঁধে ৩০,০০০ টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পড়ে। অনেক ঋণদাতা তাদের টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত ১৮৯৬ সালের ১৬ জুন ভুবনমোহন ও চিত্তরঞ্জনকে দেউলিয়া হিসেবে ঘোষণা করে।

এসব ঘটনার পর চিত্তরঞ্জন দাশ হতাশ না হয়ে পুনরায় নুতন উদ্যমে আদালতে যাওয়া শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি মামলা পেতে শুরু করেন। এসময় তাঁর যা আয় হয়, তা দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে চলতে পারেন এবং তাঁর জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিজনী রাজকোর্টের বরদাপ্রসাদ হাওলাদারের কন্যা বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পৈতৃক বসতবাড়িটি জনসাধারণের জন্য দান করে যান। সেখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর প্রয়াণ সংবাদে শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেনঃ

' এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।। "

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ দাশ তাঁর স্মরণে'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালকে প্রকাশিত হয়।

দেশবন্ধু

জীবনানন্দ দাশ

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো, বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদীমাতা।
কাল বৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইতে রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল ঊর্মির তালে-বক্ষে তবু লক্ষ কোটি পন্নগ- উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কন্ঠ-নাগ জিনি,
ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি,
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ-ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধূলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভান্ড তীব্র দর্পে, বৈরাগের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে-পৃথী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পর্শ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি;
বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শানি-প্রিয় মুমূর্ষর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব- সংবাদ
গান্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে, আছি আমি আছি !
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।
ছিলে তুমি রূদ্রের ডম্বরুরূপে, বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে-
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ফেরুকুল-সঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি একাকী
স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি।
ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকাসম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শবসাধকের বেশে-সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হলে দেশ-অধিপতি।
বিবিবশে দূরগত বন্ধু আজ, ভেঙে গেছে বসুধা-নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোকে।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতটে, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন-উচ্ছ্বাসউচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুন্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকানি- শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পূঞ্জীভূত রক্তস্রোত-রেখা। (শেষ)

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২

জেপি'র আন্দোলন জনসংঘ ও আর এস এস

পাঁচ দশক (১৯৭৪-২০২৫)-এর সামান্য বেশি সময় আগে জয়প্রকাশ নারায়ণ যে সার্বিক কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনে তিনি সমস্ত দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী,

আঞ্চলিকতাবাদী ও কিছু বামপন্থী দলকে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের মূল শ্লোগান নির্ধারিত করেছিলেন--

ক) সার্বিক বিপ্লব (Total Re volution) ও

খ) ভ্রষ্টাচার হঠাও।

তাঁর এই সার্বিক বিপ্লবের রূপটি কী তা কখনই তিনি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেননি। কখনও তিনি বলেছেন, সার্বিক নির্বাচনী সংস্কার এবং এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন তা হচ্ছে বুনিয়াদি ও তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার শাখা সংগঠন জনসংঘ শক্তি সংগ্রহ করে এবং ক্রমশ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল দক্ষিণপন্থী দলগুলি যথা সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি, ভারতীয় লোকদল প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। অপরদিকে বামঘেঁষা মধ্যপন্থী সোসালিস্টরা সমস্ত দলগুলি বিলুপ্ত করে গঠিত জনতা পার্টিতে একটি বড় শক্তি হলেও তারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে কয়েকটি আঞ্চলিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নেতা ও দল আর.এস.এস - এর রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির স্থায়ী জোটসঙ্গী হয়ে যান। যথা -জর্জ ফার্নান্ডেজ , নিতিশ কুমার প্রমুখ ও তাঁদের দল জনতা দল (ইউনাইটেড)।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও জনসংঘ সম্পর্কে অতীতে জয়প্রকাশজির বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল তা দেখা যেতে পারে। তিনি ও তাঁর সোসালিস্ট সতীর্থ আচার্য নরেন্দ্র দেব, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগের মূল কারণ ছিল সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সংঘাত।

এঁরা মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার প্যাটেলের ব্যর্থতার কথা বলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। অবশেষে কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদী শক্তির প্রতি দুর্বল এই অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও সোসালিস্ট পার্টি গঠন করেন। জয়প্রকাশজি বেশিদিন সোসালিস্ট পার্টি করেন নি জ্জ তিনি এই দল ছেড়ে আচার্য বিনোবা ভাবের আহ্বানে ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি দলহীন রাজনীতি ও গণতন্ত্রের কথা প্রচার করতে থাকেন জ্জ তবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি মতামত প্রদান করতেন।

১৯৬২ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ জাতীয় সংহতি পরিষদের সভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস)কে বেআইনি ঘোষণার দাবি তোলেন। জনসঙ্ঘের নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায় যখন তাঁকে তাঁর বক্তব্য পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন, তিনি (জেপি) এমন ক্ষিপ্ত হন যে দীনদয়াল পলায়ন করেন (বলরাজ মাধোক প্রণীত (tormy de-cade. ১৯৭০-১৯৮০. পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭)।

১৯৬৮ সালের ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২য় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় কংভেনশনের বক্তৃতায় জেপি বলেন, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তি অন্যান্য যে কোনও সংখ্যালঘু ধর্মের সাম্প্রদায়িক শক্তির থেকেও বড় বিপদ। কারণ এরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ববাদ সমার্থক বলে প্রচার করে ও যারাই এই মতের বিরোধিতা (National) করে তাদের জাতীয়তাবাদ বিরোধী (Anti National) বলে চিহ্নিত করে। তিনি বলেন, যারা 'ভারত' ও 'হিন্দু'কে সমার্থক মনে করে, ভারতীয় ইতিহাস ও হিন্দু ইতিহাসকে এক করে দেখে, বাস্তবে তারা ভারত ও হিন্দুধর্ম উভয়ের প্রকৃত শত্রু।

এই বক্তৃতায় জে.পি আরও বলেছিলেন, মহাত্মাজির হত্যার পর আর.এস.এস বলেছিল যে তারা একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির নরম মনোভাব ও উদারতার জন্য এরা আবার নিজেদের ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলেছে। এরাই হচ্ছে ভারতীয় জনসংঘের মূল পরিচালক। আর এস এস - কে সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে ভাববার কোনও কারণ নেই। যদি তাই হবে এরা তাহলে কেন একটি রাজনৈতিক দলকে (পড়ুন জনসংঘ) প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পরিচালনা করে। আর এস এসের মূল লক্ষ্য একটি সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দুদের মধ্যে তারা সর্বদাই পাকিস্তান ও মুসলমানবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর এস এস-এর শাখাগুলিতে প্রত্যহ প্রভাতকালে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর এস এস-এর সংগঠন যা দেখা যায় তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এই সংগঠন-এর অধিকাংশই অদৃশ্য (Invisible)। এটি অবশ্যই কোনও সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়। এটি একটি আধা গোপন ও গোপন সংগঠন (জয়প্রকাশ' নারায়ণ- 'A Grave disease – Nation Building in India- ব্রহ্মানন্দ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩)।

সেই জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৭৪-- ১৯৭৫ সালে আর.এস.এস জনসংঘের এই চরিত্রকে উপেক্ষা করে, তাদের সক্রিয় সহায়তা প্রার্থনা করলেন। শুধু তাই নয় তিনি তাদের দরাজ সার্টিফিকেট প্রদান করেন ও তাদের সম্মান প্রদান করেন। ১৯৭৫-এর ৫ মার্চ তিনি জনসংঘের জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তার আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান। তাঁর এই পদক্ষেপকে অর্থাৎ আর এসএস ও জনসংঘের ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্তকে যারা সমালোচনা করল তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'জনসংঘ ও আর এস এস কখনই প্রতিক্রিয়াশীলও নয় ফ্যাসিস্তও নয়। কী করে এই পার্টি ও সংগঠন যারা কিনা তাঁর সার্বিক বিপ্লব বা Total Revolutionকে সমর্থন করছে তারা প্রতিক্রিয়াশীল বা ফ্যাসিস্ত হতে পারে।' এরপর তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'যদি জনসংঘ ফ্যাসিস্ত হয় তাহলে আমিও ফ্যাসিস্ত।' (টাইমস অব ইন্ডিয়া ৬ মার্চ ১৯৭৫, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৬ মার্চ ১৯৭৫, অর্গানাইজার, ১৫ মার্চ, ১৯৭৫)। এর একমাস পর এপ্রিল মাসে এক সাক্ষাৎকারে জেপি তাঁর ওই বক্তব্য আবারও জোরের সঙ্গে উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন, ' আমি মনে করি না যে আমি কখনও আর এস এসকে ফ্যাসিস্ত বা সেমিফ্যাসিস্ত বলেছি। যদিও আমি এদের সম্পর্কে খুব বেশি জানি না। আমি অনুভব করি এদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যেমন দেশের অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে।

জনসংঘের সর্বভারতীয় অধিবেশনে আমি যে কথা বলেছি যে ’ জনসঙ্ঘ যদি ফ্যাসিস্ত হয় তাহলে আমি ফ্যাসিস্ত।’ এই কথা পরিবর্তন করার কোনও কারণ আমি দেখছি না।’

আমরা এই নিবন্ধে পরবর্তী সময়ে দেখবো জেপির এই আন্দোলন গান্ধিবাদী গঠনমূলক কর্মীদের সর্বোদয় আন্দোলনকেও কীরকম করে স্থায়ীভাবে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। আর প্রথমে সিপিআই(এম) ও পরে সিপিআই জেপির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি করতে গিয়ে সুদুরপ্রসারি নেতিবাচক ফলাফলের সম্মুখীন হয়।

ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন বাতিল

১৯৭১ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে সোসালিস্ট প্রার্থী রাজনারায়ণকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করেন। রাজনারায়ণ ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ১৯৭৫-এর ১২ জুন ওই আদালতের বিচারক জগমোহন সিনহা তাঁর রায়ে ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তাঁর নির্বাচনের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ ১৪ দফা অভিযোগ করেছিলেন যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর সব অভিযোগ ছিল। ১২ দফা অভিযোগের কোনও সত্যতা ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই বললেও বিচারক সিনহা দুটি মামুলি অভিযোগে শ্রীমতী গান্ধির নির্বাচন বাতিল করে। এই দুটি অভিযোগ অত্যন্ত ঠুনকো ও হাস্যকর।

প্রথম অভিযোগটি ছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার একটি নির্বাচনী সভায় যে ‘ মঞ্চ ‘ বানিয়ে দিয়েছিল তা হিল সুউচ্চ ও সভার মাইক-এ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁর বক্তৃতা শ্রবণযোগ্য করার জন্য।

দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল শ্রীমতী গান্ধির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে যশপাল কাপুর নামক সরকারি অফিসার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত হওয়া ও গেজেট নোটিফিকেশন হবার আগেই তিনি নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেন।

১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধির নির্বাচনী প্রচারের সময়ে ইউপিতে বিরোধী সরকার ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আদি কংগ্রেসের চন্দ্রভানু গুপ্ত। এটি বরাবরের নিয়ম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে এলেও তাঁর সভামঞ্চ নির্মাণ, মাইকের ব্যবস্থা সবই রাজ্য সরকারকে করতে হয়। সুউচ্চ মঞ্চ নির্মাণের দায় কী করে প্রধানমন্ত্রীর ওপর বর্তায় ? দ্বিতীয়ত কোনও সরকারি অফিসার এর ছুটি বা ইস্তফাপত্র তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেই হয়। সেটি যতক্ষণ না রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করছেন বা গেজেট Notification হচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে, .এরকম অদ্ভুত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় । তবে বিচারপতি সিনহা শ্রীমতী গান্ধিকে সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের জন্য সময় দেন। শ্রীমতী গান্ধি সুপ্রীম কোর্টে আপিল করেন। ১৪ জুলাই চূড়ান্ত শুনানি হওয়ার কথা ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিকালীন বিচারক ওয়াই.ভি.কৃষ্ণ.আয়ার ২৪ জুন একটি অন্তর্বর্তী রুলিং দেন যাতে বিভ্রান্তি ও ইন্দিরা গান্ধি বিরোধী প্রচারের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। বিচারক আয়ার তাঁর রায়ে বলেন, যতক্ষণ না সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত শুনানি ও রায় হচ্ছে ততক্ষণ এলাহাবাদ. হাইকোর্টের রায় স্থগিত থাকবে। শ্রীমতী গান্ধি পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু তিনি ভোট দিতে পারবেন না। সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার যিনি ইন্দিরা গান্ধির তীব্রভাবে বিরোধী ছিলেন ও জরুরি অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনিও এই রায় সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘যে অভিযোগে একজন প্রধানমন্ত্রীর পদচ্যুতি ঘটানো হয় তা ছিল অত্যন্ত ঠুনকো। এটা হচ্ছে অনেকটা একজন প্রধানমন্ত্রীকে, তাঁর চালক ট্রাফিক রুল ভেঙেছে বলে প্রাণদণ্ড দেওয়া।’

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ বলেন, ‘একজন অহমিকা সর্বস্ব বিচারক যাঁর রাজনীতি সম্পর্কে ধ্যানধারণার চূড়ান্ত ঘাটতি আছে, তিনি সম্ভবত কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া, কিন্তু অবশ্যই অযাচিতভাবে এই অদ্ভুত রায়ের দ্বারা দেশজুড়ে এক রাজনৈতিক ডামাডোল সৃষ্টি করেন।’ বিরোধীরা অর্থাৎ আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি, লোকদল , জনসঙ্ঘ ও সোসালিস্ট পার্টি ‘ মহাজোট’ গঠন করে ১৯৭১-এর নির্বাচনেযা করতে পারেনি বিচারক সিনহা তাদের জন্য সেই কাজটিই করে দেন।

বিরোধীদের কাছে এই সুযোগ ছিল অপ্রত্যাশিত। তারা কিছুই করতে পারছিল না। এমনকী তাদের জোট গুজরাতের নির্বাচনেও কংগ্রেসের থেকে কম ভোট পেয়ে বেশি আসন পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কগ্রেস থেকে দলত্যাগী সেই দুর্নীতিগ্রস্ত চিমনভাই প্যাটেলকে নিয়েই পরবর্তীকালে তাদের অবশেষে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। এবার তারা সমস্বরে ইন্দিরা গান্ধিজির পদত্যাগ দাবি করতে লাগল। সিপিআই(এম) এই দাবিকে সমর্থন করলেও বিরোধী মিছিলে যোগ দেয়নি।

প্রাথমিকভাবে ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগ করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই আইনজ্ঞ ননি এ পালকিওয়ালা ও ফলি এ নরিম্যান বলেন সুপ্রিম কোর্ট ওই রায় অবশ্যই বাতিল করবে। কেননা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের কোনও আইনগত গভীরতা নেই। দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীরা বলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগ করে অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রীর, দায়িত্ব দিলে তাঁকেও বিরোধীরা কাজ করতে দেবে না। কাজেই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত হবে না। ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেন।

(ক্রমশ)